গোরস্থানে গুপ্তধন

পরিচয় গুপ্ত

পরিবেশক
নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ১৯৬২

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা-৭০০০২৯

মুদ্রাকর
প্রশান্তকুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১বি গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

অলংকরণ
লেখক স্বয়ং

স্নেহাস্পদ সুভাষ দে-কে

লেখকের অন্যান্য বই :

আষাঢ়ে ভূতের গপ্প
লম্বুদার গপ্প
খেয়ালী রাজার কাণ্ড
রহস্যের ধোঁয়া
পাতালে লম্বুদা
ভৌতিক শিকার কাহিনী
মানুষ যখন ভয়ংকর
ভূত যখন পুত
ছায়ামূর্তি

আমাদের বসত বাড়ির সংলগ্ন জমিতে প্রতিষ্ঠিত কালী মন্দিরটি, সি. এম. ডি. এর পথ সম্প্রসারণ প্রকল্পের মধ্যে পড়ায় বাড়িতে রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেল।

এই কালী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা ৺দেবনাথ গুপ্ত সম্পর্কে আমার জ্যাঠামশাই। তিনি সংসার ধর্ম করেন নি। ঠাকুর্দা প্রদত্ত এই ভূ-সম্পত্তির প্রতি তাই তাঁর কোন মোহও ছিল না। তাছাড়া মিলিটারী সার্ভিসে থাকার জন্য তাঁকে প্রায় বাইরে বাইরেই ঘুরতে হত। কালে-ভদ্রে ছুটি পেলে তিনি এখানে এসে কটা দিন বিশ্রাম করতেন। তারপর যথারীতি ফিরে যেতেন তাঁর কর্মস্থলে।

একবার তিনি ছুটিতে এসেই হঠাৎ এই কালী মন্দিরটি তৈরী করালেন আমাদের বাড়ির সংলগ্ন তাঁর ভাগের জমিতে। বললেন, চাকুরির মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। রিটায়ার করে একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো। সেইজন্যেই শরীর ও মন অটুট থাকতে থাকতে তিনি এই কাজে হাত দিয়েছেন।

মন্দিরের কাজ শেষ হতে, তিনি রিটায়ার করে ফিরে না আসা পর্যন্ত এই মন্দির তদারকির ভার বাবার ওপরেই দিয়ে গেলেন। বললেন, টাকার জন্য ভাবিস নি আমি মাসে মাসে এম. ও-তে পাঠিয়ে দেব। পূজার্চ্চনায় দেখিস যেন কোনও ত্রুটি না হয়।

এটাই জ্যাঠামশাইয়ের ইহকালের শেষ কথা। যথারীতি ছুটি

কাটিয়ে কর্মস্থলে ফেরার পথে এক প্লেন ক্র্যাশে জ্যাঠামশাইয়ের মৃত্যু হল। এই মৃত্যু সংবাদ পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে এই কালীমন্দির দেখা শুনার পুরো দায়িত্বই বাবার কাঁধে চাপল। বাবা তা খুশি মনেই মেনে নিলেন এবং পরম নিষ্ঠার সঙ্গেই দেবীর সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন।

বিগত দশবছর সেইভাবেই চলেছিল। কিন্তু বাবা হঠাৎ সন্ন্যাস রোগাক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করায়, উত্তরাধিকারী সূত্রে আমার ওপরেই সব দায়িত্ব পড়ল। রক্ষণাবেক্ষণের কিছু কিছু দায়িত্ব আমি নিজের হাতে নিলেও প্রকৃতপক্ষে মা-ই সব কিছু দেখাশুনা করছিলেন।

এই মন্দির অপসারণের দুঃসংবাদে স্বভাবতঃই আমাদের পরিবারে একটা বিষাদের ছায়া নেমে এল।

সি. এম. ডি. এ-র এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে আমাদের করার কিছুই ছিল না। আমরা বিষণ্ণ চিত্তেই সেই দিনের অপেক্ষায় রইলাম। বাড়িতে পাঠানো নোটিশ অনুযায়ী নির্ধারিত দিনে যথারীতি তাদের কর্মচারীরা এসে হাজির হল লোক-লস্কর নিয়ে।

মন্দিরটি ভাঙার আগেই দেবী মূর্তিটি অন্যত্র স্থানান্তর করার জন্য আমরা অনুরোধ জানালাম তাদের। কারণ সে কাজটি খুব সহজসাধ্য ছিল না।

তারা কোনও রকম আপত্তি না করে আমাদের অনুরোধ মতোই কাজ শুরু করে দিল। ঠিক হল নতুন মন্দির তৈরী না হওয়া পর্যন্ত ওই দেবী মূর্তিটি আপাততঃ আমার ঘরেই এনে রাখা হবে। কিন্তু সে

কাজ খুব সহজ হল না। কালী মূর্তিটি স্থানান্তর মুহূর্তে বিশেষ এক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল।

কংক্রীটের একটি বেদির ওপর দেবীর পদযুগল এমনভাবে আটকে দেওয়া হয়েছিল, বেদি ভেঙে দেবীমূর্তি স্থানান্তর করা ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। কিন্তু বেদি ভাঙতে গিয়েই বিপত্তি ঘটল। কিছুটা ভাঙার পর, ইঁটের খাঁজের ভেতর থেকে একটা রৌপ্য নির্মিত ফুলদানি পাওয়া গেল।

ফুলদানি দেখে রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেল বাড়িতে। দেবীমূর্তির সঙ্গে ফুলদানির কি সম্পর্ক থাকতে পারে কারুর মাথায় এল না। সকলেই মনগড়া নানারকম কথাবার্তা বলতে শুরু করল।

ক্রমশঃ সেটা হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে প্রায় বেহাত হয়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা দিল। সব গল্প-গুজবের অবসান ঘটিয়ে আমি শেষ পর্যন্ত ফলদানিটা লোকচক্ষুর আড়ালে সরিয়ে ফেললাম।

এদিকে দেবীমূর্তি ঘরে সরিয়ে আনার পর, আবার মন্দির ভাঙার কাজ শুরু হল।

আমরা সবিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। দিনান্তে জ্যাঠামশাইয়ের জীবনস্মৃতি ধূলিসাৎ হয়ে গেল আমাদের সকলের চোখের সামনে থেকে।

এই কালী মন্দির ভাঙার কি কি অশুভ পরিণতি ঘটতে পারে, সেই দুশ্চিন্তায় যখন প্রায় সবাই বিভোর, আমার মনটা কিন্তু তখন পড়েছিল ওই রুপোর ফুলদানির ওপর। জ্যাঠামশাই এত জিনিস থাকতে হঠাৎ ওই ফুলদানিটাই বা কেন রাখলেন দেবী-পদমূলে।

তবে কি কোনও রকম মানত ছিল ? কিন্তু কার জন্যেই বা তিনি মানত করবেন ? বিয়েথাও করেননি, চিরকালই তো এদেশ ওদেশ ঘুরে ঘুরে কাটাচ্ছিলেন। একান্ত আপনার জন বলতে তো খালি আমরাই ছিলাম। আমাদের লুকিয়ে কেন তিনি রেখেছিলেন ওটা সেখানে ?

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতেই ফুলদানিটা বার করলাম আলমারির তালা খুলে। বেশ ভারী ওজনে। কম করে তো পাঁচশো গ্রাম হবেই।

সেটা নিয়ে গিয়ে আমি দাঁড়ালাম আলোতে। গায়ে ধুলোর প্রলেপ থাকার জন্য সর্বাঙ্গ ভালো করে দেখা যাচ্ছে না। তবে যেখানে ময়লা কম বিচিত্র ধরনের কিছু নক্‌সা উঁকি মারছে সেখানে।

গামছাটা জলে ভিজিয়ে ঘষতে লাগলাম ওই ফুলদানির ধূলিময় গা-টা। পূর্বের ঔজ্জ্বল্য ফিরিয়ে আনতে খুব বেশী বেগ পেতে হল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার স্বরূপটা ফিরে এল।

ফুলদানিটা সম্পুর্ণ পরিষ্কার হতে, বেশ একটু অবাক হয়ে গেলাম। আসলে যেটাকে এতক্ষণ নক্‌সা বলে মনে হচ্ছিল, সেটা ঠিক নক্‌সাই নয়—কোনও একটা পথ নির্দেশ হবে। কারণ সেখানে প্রাকৃতিক দৃশ্যের সঙ্গে স্থাপত্য শিল্পের এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটানো হয়েছে।

তারই মাঝামাঝি এক জায়গায় চিহ্নিত করা হয়েছে এক কঙ্কালের মুখাবয়ব। এখানেই আমাকে থামতে হল। এমন সুদৃশ্য ফুলদানির গায়ে এই অঙ্কন স্বভাবতঃই অপ্রত্যাশিত এবং কিছুটা বেমানানও বটে।

বেশ কিছুটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। ফুলদানির গায়ে বারবার চোখ বোলাতে বোলাতে ভেতরেও একবার চোখ বুলিয়ে

নিলাম। কি জানি তার মধ্যেও যদি ধনরত্ন কিছু লুকানো থাকে। না কিছুই নেই। পুরোটাই ফাঁপা! ফুলদানিটা এতক্ষণ সোজা করেই ধরে ছিলাম। নাড়াচাড়া করতে করতে একবার সেটা উলটোতেই বিস্ময়ের পালা এল।

হলদেটে রঙের ভাঁজ করা একখানা চিরকুট ফুলদানির পেছনে আঠাজাতীয় কোন বস্তুর সাহায্যে সাঁটা রয়েছে।

সরাসরি না হলেও হয়তো বা এমন একটি বস্তুই আমি মনে মনে চাইছিলাম। ছিঁড়ে যাওয়ার ত্বরাশঙ্কায় খুব সন্তর্পণেই সেটা আমি খুলে নিলাম পেছন থেকে। চিরকুটটির ভাঁজ খুলতেই চোখে পড়ল জ্যাঠামশাইয়ের নিজের হাতে খুদি খুদি লেখা একখানি সুদীর্ঘ চিঠি। লেখাগুলো একটু অস্পষ্ট হয়ে গেলেও পড়ার কোন অসুবিধা ছিল না।

মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সবেমাত্র সেটা পড়ার জন্য তৈরী হয়েছি, হঠাৎ সদরের কড়াটা কে যেন নাড়ল। বহিরাগত কোনও অতিথির সমাগম হয়েছে সেটা বুঝতে কোনই অসুবিধা হল না। তাড়াতাড়ি চিঠিটা পকেটে পুরে ফেললাম। এবং ফুলদানিটাও আলমারিতে লুকিয়ে রাখলাম।

ইতিমধ্যে চাকরটা কপাট খুলে দিলে। সহাস্য মুখে ঢুকলেন আমাদেরই এক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশিনী ওরফে নিভামাসি।

নিভামাসি এই এলাকার অন্যতম পুরানো বাসীন্দা। নিভা মাসির স্বামী ললিতমোহন বাবু আমার জ্যাঠামশাইয়েরই সমবয়সী। দু'জনেই একসাথে মিলিটারীতে ছিলেন এবং গলায় গলায় তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ললিতমোহন বাবুর আকস্মিক

স্বাস্থ্যচ্যুতি ঘটার কারণে কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন এবং পেনসন ভোগ করতে থাকেন। ইতিমধ্যে ভাগ্য বিরূপ হওয়ায় জ্যাঠামশাইও স্বর্গারোহণ করেছেন।

নিভামাসি এসে সৌজন্যমূলক কিছু খবর বিনিময়ের পর, কালী মন্দির প্রসঙ্গেই ফিরে এলেন। আঁচল দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন, শুধু শুধুই ওরা মন্দিরটা ভেঙে দিয়ে গেল? রাস্তাটা একটু ঘুরিয়ে নিয়ে গেলেই বা কি ক্ষতি হত।

ছেলেপুলে নিয়ে আমরা ঘর করি। একটা কিছু অকল্যাণ ঘটলে কে দেখবে। কি দিনকালই পড়ল! ঠাকুর দেবতায় পর্যন্ত গেরাছ্যি নেই!

তারপর চোখ মুছতে মুছতে এগিয়ে এলেন আমার ঘরে। সাষ্টাঙ্গে দেবীকে একটা প্রণাম করার পর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, হ্যাঁ বাবা, মূর্তির সঙ্গে নাকি কি একটা পাওয়া গিয়েছে শুনলাম। সত্যি নাকি খবরটা?

তিনি যে ঘুরিয়ে ফুলদানির কথাই জানতে চাইছেন তা বুঝতে অবশ্য আমার কোনই অসুবিধা হল না। কারণ ফুলদানির প্রাপ্তি সংবাদ ইতিমধ্যেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম, হ্যাঁ আপনি ঠিকই শুনেছেন। বেদীর ভেতর থেকে একটা রুপোর ফুলদানি বেরিয়েছে। তা বেশ পুরানোই হবে।

জ্যাঠামশাইয়ের জ্ঞাতসারে না অজ্ঞাতসারে ওটা ওখানে রাখা হয়েছিল এখন সেটাই জানা দরকার। কারণ জ্যাঠামশাই আমাদের কোন কিছুই বলে যান নি।

নিভামাসি তাঁর পুরু লেন্সের মধ্যে দিয়ে অপলক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তার এই চাউনিটা কেমন যেন অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াল আমার কাছে।

আমাকে উসখুস করতে দেখে এইবার নিভামাসি একঝলক অকারণ হাসলেন। বললেন, তোর মেসোর ওই ফুলদানিটা দেখার খুব ইচ্ছে। আমি এখানে আসছি শুনে বার বার আমাকে বলে দিল, ওদের কোনও অসুবিধা না থাকলে ফুলদানিটা একবার এনো। দেখে ফেরত পাঠিয়ে দেব। আমার তো নড়ার ক্ষমতা নেই।

তোর যদি আপত্তি না থাকে তো তুই ওটা আমার হাতে একবার দিতে পারিস।

মাসির আবদার কিছু অযৌক্তিক মনে হল না। কিন্তু ফুলদানির পেছনে পাওয়া জ্যাঠামশাইয়ের স্বহস্তে লিখিত চিরকুটটা তখনও পর্যন্ত আমার পড়া শেষ না হওয়ার জন্য, হঠাৎ মনটা কেমন খচখচ করে উঠল। মন বাদ সাধতে, অগত্যা মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে ফেললাম। বললাম, সেটা তো এখন আমার কাছে নেই। পাশের বাড়ির রমেনদা দেখতে নিয়ে গিয়েছে। ফেরত দিলে বরং আপনাকে পাঠিয়ে দেব। আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না।

তাই নাকি ? একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন নিভামাসি। একমুহূর্ত কি যেন ভাবলেন। মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে, তাই দিস। তাড়াহুড়োর কিছুই নেই। এখন তাহলে উঠি কেমন। দেখতো বাবা, তোর মা কোথায় গেল ? এলামই যখন দু'মিনিট গল্প করে যাই। মাসি উঠে দাঁড়ালেন। আমি মাকে খবর দিতে রান্নাঘরের দিকে এগুলাম।

মা ভাতের ফ্যান গালছিল। আমি গিয়ে দাঁড়াতেই ইশারায় আমার আসার কারণ জানতে চাইল। আমি নিভামাসির সদিচ্ছার কথা জানালাম তাকে।

ফ্যানটা গেলেই মা আসবে বলে জানাল আমাকে।

নিভামাসিকে সে খবরটুকু পৌঁছে দিতে গিয়েই আমি অবাক হলাম। নিভামাসি ঘরের মধ্যে বেশ দ্রুতপদেই ঘোরাফেরা করছেন।

আমি ঘরে ঢুকতেই তিনি একটু থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, মায়ের আসতে দেরী হবে নাকি? তাহলে আমি চলি। রান্নাবান্না আছে তো আবার। পরে দেখা হবে বলে দিস মাকে।

নিভামাসী আর দাঁড়ালেন না। হন্‌হন্‌ করে তিনি সদরের দিকে এগুলেন। এদিকে আলমারির দিকে আমার চোখ পড়তেই চমকাবার পালা এল। আলমারির পাল্লাটা যেন ঈষৎ খোলা রয়েছে।

কিন্তু যতদূর আমার মনে পড়ল আলমারিটা আমি চেপেই বন্ধ করেছিলাম। খোলা থাকার কোনও কারণ খুঁজে পেলাম না। তবে ভুল হতেই পারে। বিশেষ করে তাড়াহুড়োয় এ ধরনের ভুল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। আলমারিটা খুলে দেখলাম ফুলদানিটা তাকের ওপর যথারীতি শোয়ান রয়েছে। কিন্তু আমার মন যেন বলল ওটা আমি দাঁড় করিয়েই রেখেছিলাম। মনের ভুলের সান্ত্বনায় আমি এ নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামালাম না।

জ্যাঠামশাইয়ের লেখা সেই চিরকুটটা নিয়ে আমি চেয়ারে বসলাম। এবং ভাঁজ খুলে চিঠিটা চোখের সামনে মেলে ধরলাম।

‘স্বীকারোক্তি’ শিরোনামায় লেখার বয়ানটি মোটামুটি এইরূপ ঃ

ছোটবেলা থেকেই আমি একটু ডানপিটে ছিলাম। বি. এস. সি. পাশ করার পর যখন কোন লাইনে যাব ভাবছি ঠিক সেই সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধল।

যুদ্ধে নাম লেখানোর জন্য তখন পাতা জোড়া বিজ্ঞাপন বেরুতে লাগল দেশীয় খবরের কাগজগুলোতে।

আমি মিলিটারীতে চাকুরি নিই, বাবা বা মায়ের একদমই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু আমি তাঁদের লুকিয়েই একখানা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিলাম।

যথাসময়েই আমার ইণ্টারভিউ হল। আমি নির্বাচিত হলাম নৌবাহিনীতে। ছ’মাস ট্রেনিং। তারপরই সরাসরি রণপোতে চড়ে পাড়ি জমাতে হবে রণক্ষেত্রে। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দেখে বাড়িতে সকলের মুখ গোমড়া হল বটে, কিন্তু আমি মনে মনে খুব খুশিই হলাম। নির্ধারিত তারিখেই যোগদান করলাম নৌবাহিনীর সদর কার্যালয়ে।

অভিজ্ঞতা না থাকায় কেতাবি ও হাতে-কলমে দুইরকম শিক্ষাই একসাথে চলতে লাগল আমার। এজন্য আমাকে প্রায়ই বিভিন্ন বৃটিশ রণপোতে নিয়ে যাওয়া হত। সেখানে এইসব রণপোতের প্রধানেরা আমাদের যুদ্ধচলাকালীন জাহাজ চালনার রীতি-নীতি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন এবং তাদের বীরত্ব-ব্যঞ্জক কাহিনীগুলো কথা প্রসঙ্গে শোনাতেন।

ট্রেনিং শেষ হতে, কর্তৃপক্ষ আমার কর্মকুশলতায় এতই খুশি হলেন যে আমাকে উচ্চ শিক্ষার্থে বিলাতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিলেন।

তখনকার দিনে বিলাত যাওয়া রীতিমতো একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। সহসা সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হওয়াতে আমি যৎপরনাস্তি খুশিই হলাম।

যথাসময়ে আমি বিলাতে পৌঁছলাম। সেখানে ন্যাভাল ট্রেনিং কলেজে আমার উচ্চশিক্ষা শুরু হল।

সৌভাগ্য যখন আসে তখন বোধহয় কোনও বাধাই মানে না।

পৃথিবীর বৃহত্তম রণতরী প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের ক্যাপ্টেন জন বিলি কুপারের সঙ্গে ঘটনাক্রমে আমার পরিচয় হল। এই জাহাজ চালনায় তার তুজন সহযোগী থাকলেও আর একজন কুশল সহযোগীর প্রয়োজন ছিল। তিনি বললেন, মিঃ গুপ্ত, তোমাকে আমার খুব পছন্দ। আমি যদি তোমার নাম প্রস্তাব করি, তুমি এখনই এই জাহাজে যোগদান করতে রাজী আছ? ভেবে দেখ—

একমুহূর্তও বিলম্ব করিনি সে প্রশ্নের জবাব দিতে। এই সুবর্ণ সুযোগ কেই বা ছাড়ে! ফলে আমার শিক্ষাকাল উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই আমি ক্যাপ্টেন বিলি কুপারের সহযোগী পদে বহাল হয়ে গেলাম। সর্বসাকুল্যে আমার বেতন স্থির হল পাঁচশত পাউণ্ডের মত। এছাড়াও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তো আছেই।

আমার এই অভাবনীয় উন্নতির খবর যথাসময়ে বাড়িতে পৌঁছল। এবং রীতিমত হৈচৈ পড়ে গেল। কারণ একজন ভারতীয়ের পক্ষে তখন এই পদে আসীন হওয়া কম কথা নয়।

আমার সৌভাগ্যের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে আমার অন্যতম সহপাঠী ললিতমোহনও নেভীতে যোগদান করল এবং দ্রুত ভাল ফল দেখাতে শুরু করল।

লাভ বই লোকসান হল না। তাকেও সুযোগ দেওয়া হল বিলাতে এসে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য।

বিলাতে এসে পর্যন্ত কিন্তু সে ওদিকে নজর না দিয়ে লেগে রইল আমার পেছনে। বিলি কুপারকে ধরে করে প্রিন্স অব ওয়েলসে একটা কাজের সুযোগ করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল।

স্বদেশ হলে কি করতাম জানি না, বিদেশ বলেই হয়তো এ ব্যাপারে তার প্রতি সহানুভূতি দেখানো আমার অন্যতম কর্তব্য বলেই ধরে নিলাম। এবং ললিতমোহনকে এই জাহাজেই একটা চাকুরিরও ব্যবস্থা করে দিলাম।

তবে সহযোগী হিসেবে নয়, যুদ্ধ সামগ্রীর তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে।

এদিকে বিশ্বযুদ্ধ তখন ক্রমেই দানা বেঁধে উঠেছে। হিটলারের প্রচণ্ড আক্রমণ ঠেকাতে হিমসিম খাচ্ছে মিত্র বাহিনী।

প্রতিদিনই একটা না একটা দেশের আত্মসমর্পণের খবর এসে পৌঁছচ্ছে আমাদের কানে।

মুখে আমরা যাই বলি না কেন, মনে মনে যে একটু ভীত হয়ে না পড়ছিলাম তা নয়। ক্যাপ্টেনও ক্রমশঃ গম্ভীর হতে শুরু করেছিলেন।

একদিন তো তিনি আমাকে ফিসফিস করে বললেন, মিঃ গুপ্ত, যে কোনও বিপর্যয়ের জন্যেই তৈরী থেকো। ভাবগতিক তো বিশেষ ভালো ঠেকছে না। এদিকে ললিতমোহনও অবসর পেলেই আমার

কাছে আসে। মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, কি রে, শেষকালে কি বোমা খেয়েই মরতে হবে নাকি? এমন চাকুরি না করলেই বোধহয় ভালো হত।

আমি অবশ্য তাকে ভরসাই দিতাম। বলতাম, ঘাবড়াচ্ছিস কেন যুদ্ধের মতিগতি কিছুই বলা যায় না। কিন্তু আমি ভরসা দিলে কি হবে, হিটলার তো আর থামবার পাত্র নয় সে দুর্মদ গতিতেই এগিয়ে আসতে লাগল।

এইসময় একদিন খবর এল শত্রুপক্ষ ভারত আক্রমণের পথে পা বাড়িয়েছে এবং রেঙ্গুন দিয়ে ভারতে ঢোকার মতলব আঁটছে। সঙ্গে সঙ্গেই হেডকোয়ার্টার থেকে আমাদের ওপর নির্দেশ এল, রেঙ্গুন পাহারা দাও। শত্রুপক্ষকে আটকাও।

শত্রুপক্ষ যেভাবেই আক্রমণ করুক না কেন আমরা তা রুখতে বদ্ধপরিকর। কারণ যে কোনও আক্রমণ ঠেকাবার সবরকম অস্ত্রশস্ত্রই আমাদের জাহাজে ছিল।

শত্রুপক্ষও সেটা ভালোভাবেই খোঁজ-খবর রেখেছিল। আক্রমণের ধারাটাও তাই তারা পাল্টাল।

সম্মুখ সমর এড়াতে তারা এক নতুন ফন্দি আঁটল। কয়েকটা জঙ্গী বিমানকে পাঠাল আক্রমণের জন্য।

যথাসময়েই শত্রু আক্রমণের খবর এসে পৌঁছল জাহাজে। শত্রু পক্ষের যে কোনও রকম আক্রমণের মুখোমুখি হবার জন্য আমরাও তৈরী। তাদের এক ঝাঁক জঙ্গী বিমান বোমা ফেলার জন্য নেমে এল নীচেতে কিন্তু আশ্চর্য বোমা ফেলল না। বমাল ঢুকে গেল জাহাজের চিমনিগুলোর ভেতরে।

এর পরিণতি কি হল তা আর লেখার প্রয়োজন নেই। বিপদের ঘণ্টা বেজে উঠল জাহাজে। ব্যাপারটা কি ঘটল তখনও সকলে ভালো করে বুঝে উঠতে পারে নি। সকলেই প্রাণভয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করল এবং লাইফ সেভিং বোট নিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল।

চারদিকে যখন চাঞ্চল্য, ক্যাপ্টেন কিন্তু তখনও ধীর স্থির। সকলকে উৎকণ্ঠিত না হবার জন্যই তিনি আবেদন জানাতে লাগলেন বার বার।

এদিকে ললিতমোহন অনেক আগেই আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। এই বিপদ মুহূর্তে কি করণীয় নিজের বুদ্ধিতে সে-ও ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না।

এদিকে আগুন তখন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়েছে সারা জাহাজে। এর হাত থেকে রেহাইয়ের কোন পথই আর খোলা নেই সামনে।

এই বিপদের খবর যথারীতি চারদিকে চলে গিয়েছে। হেড-কোয়ার্টারের নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত আপাততঃ ক্যাপ্টেনের কিছুই করার নেই।

তিনি পাথরের মতোই স্তব্ধ হয়ে বসেছিলেন তাঁর নির্দিষ্ট কেবিনের মধ্যে।

আমরা দু'জনেই তাঁর নির্দেশের অপেক্ষায় ছিলাম। তিনি হঠাৎ আমাদের ডেকে তাঁর সামনে বসালেন। বললেন, ফ্রেণ্ডস, অন্তিম মুহূর্ত উপস্থিত। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো আমাকে চলে যেতে হবে এই জাহাজের সাথে সাগরের তলায়। তোমরা এখন চলে যেতে

পার, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই জাহাজ জলে ভাসবে, এই জাহাজ ছেড়ে আমার যাবার উপায় নেই।

কিন্তু যাবার আগে তোমাকে একটা দায়িত্ব এবং একটা উপহার দিয়ে যেতে চাই। আশা করি তুমি তা গ্রহণ করবে।

ক্যাপ্টেন খুব দৃঢ় চিত্তেই কথাগুলো বলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ক্যাপ্টেনের ব্যবহারে ইতিমধ্যেই আমি তাঁর খুব অনুরক্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর এই মৃত্যুলগ্নের অনুরোধ শোনার সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, বলুন স্যার, আমি আপনার জন্য কি করতে পারি?

ক্যাপ্টেন মুখ থেকে চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে মৃদু হাসলেন। টেবিলের ওপর রক্ষিত এ্যাটাচিকেশটা খুলে একটা হীরের আংটি বার করে আমার হাতে দিয়ে বললেন, এটা তোমায় আমার মিসেসের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। আগামী মাসে আমাদের বিবাহ-বার্ষিকী। বিবাহ-বার্ষিকীতে তাকে একটা হীরের আংটি দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম আমি। আমি না থাকলেও আমার উপহারটা যেন সে পায়। এই কাজটুকু তুমি কর আমার জন্য।

ক্যাপ্টেন আবার হাসলেন। কিন্তু এ হাসিটা কেমন যেন করুণ মনে হল। কিন্তু সেটা সাময়িক।

এবার তিনি পকেট থেকে নোটবুকটি বার করে বেছে বেছে একটা পাতা বার করে ছিঁড়ে ফেললেন তা থেকে। তারপর সেটা আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন—এটাই আমার বাড়ির ঠিকানা। তাছাড়া এতে আমার শেষ কথাটিও লেখা আছে আমার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে।

আমি সাগ্রহে ক্যাপ্টেনের হাত থেকে সেটা নিলাম। এবং সযত্নে কোটের ভেতর পকেটে উপহার সমেত চিরকুটটা রাখলাম।

এদিকে জানালা দিয়ে তখন ধূমায়িত অগ্নিশিখা দেখা যাচ্ছে। এবং বাতাসের প্রাবল্যে ক্রমশঃই তা আগ্রাসীরূপ ধারণ করছে।

ক্যাপ্টেন নীরবে সেদিকে তাকিয়ে বেশ কয়েক বার চুরুটের ধোঁয়া ছাড়লেন। এবার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হ্যাঁ, এবার আর একটা কাজের কথা বলি।

তুমি যখন ভারতীয় তোমাকে সবিস্তারে বলার প্রয়োজন নেই। সংক্ষেপেই বলছি।

বছর দশেক আগে আমি একবার দিল্লীতে গিয়েছিলাম চাকুরি সংক্রান্ত কাজে। কাজ সেরে ভাবলাম এসেছিই যখন ঐতিহাসিক আগ্রা ফোর্টটা দেখেই যাই। সেকালের যুদ্ধ পদ্ধতি সম্পর্কে একটা ধারণাও মিলবে।

গাড়ি চালিয়ে দিল্লী থেকে সোজা আগ্রায় চলে গেলাম। ফোর্টটা দেখলাম ঘুরে ঘুরে। কি অদ্ভুত সব ব্যবস্থাই ছিল তখনকার কালে।

ফোর্ট দেখে গাড়িটা যমুনা নদীর ধারে রেখে যখন সেখানে একটু বিশ্রাম করছি হঠাৎ দেখলাম, এক বৃদ্ধ ফকির ইঙ্গিতে আমার কাছে কিছু খেতে চাইল এবং পেট দেখিয়ে বললে, বেশ কিছুদিন সে অনাহারে রয়েছে।

আমি মানিব্যাগ খুলে তাকে একটা টাকা বাড়িয়ে দিলাম। কিন্তু সে সেটা নিতে চাইল না। বললে, ভীষণ ক্ষুধার্ত। টাকা নিয়ে খাবার খুঁজে কেনার মত সামর্থ্য তার দেহে নেই।

আমি খুবই বিব্রত হলাম। কি করি শেষ পর্যন্ত গাড়িতে নিজের জন্য যে লাঞ্চ প্যাকেটটা কেনা ছিল, সেটাই এনে দিলাম তাকে।

বললাম এর বেশী আর আমি কি করতে পারি? খাবারের প্যাকেটটা হাতে পেয়ে যেন সে আকাশের চাঁদ হাতে পেল। প্যাকেটটা ধীরে সুস্থে খোলার পর্যন্ত তর্ সইল না তার। সেটা

তোমাকেও আমি স্মরণীয় কিছু একটা দিতে চাই।
তুমি গুপ্তধন নেবে, গুপ্তধন?

মোচড় দিয়ে ছিঁড়ে ফেলেই গোগ্রাসে খেতে লাগল খাবারগুলো।

নিমেষের মধ্যেই শেষ করল সে প্যাকেটটা। তারপর যমুনার জল খেল কোঁৎ কোঁৎ করে এক পেট।

এবার সে চেয়ে রইল আমার দিকে কৃতজ্ঞতার দৃষ্টিতে। ভাঙা ভাঙা হিন্দী আর উর্দুতে মিশিয়ে বললে, তুমি আজ আমার প্রাণ বাঁচালে। তিনদিন আমি অভুক্ত ছিলাম। আল্লার কাছে প্রার্থনা করে যা পাইনি, আজ তুমি তাই আমায় দিয়েছ। তোমার এ দান স্মরণীয় হয়ে থাকবে আমার কাছে। তোমাকেও আমি স্মরণীয় কিছু একটা দিতে চাই। তুমি গুপ্তধন নেবে, গুপ্তধন ?

কথাটা প্রায় ব্যঙ্গের মতোই আমার কানে শোনাল। ভাবলাম লোকটার নির্ঘাত মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। তা না হলে এমন কথা কোনও কালে কেউ বলে !

আমি না হেসে থাকতে পারিনি। বললাম, আছে নাকি, দাও না ! তাহলে তো বেঁচে যাই। জীবন নিয়ে আর এমন মরণ খেলা খেলতে হয় না।

সঙ্গে সঙ্গেই সে এই রুপোর ফুলদানিটা তার ঝোলার মধ্যে থেকে বার করে আমার হাতে দিয়ে বললে, গুপ্তধনটা এখানেই কোথায় আছে। ফুলদানির গায়ে আঁকা ছবি থেকেই অনুমান করতে পারবে। এটাই হল তার নকশা।

তবে এর বিস্তৃত ব্যাখ্যা লেখা আছে এই চিরকুটটায়। বলেই সে ফুলদানির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে হলদেটে ময়লা ও ভাঁজ করা একখণ্ড কাগজ আমার হাতে দিয়ে বললে, এই নাও, এখানে সাঙ্কেতিক শব্দে গুপ্তধনের অবস্থান লেখা আছে। দেখো এটা যেন হারিও না।

কাগজখণ্ডটা হাতে নিয়ে আমি যা পড়লাম বোঝাই মুস্কিল। কারণ সেখানে প্রতিটি শব্দের মাঝের কোনও কোনও বর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে। সে আমায় বাধা দিয়ে বললে, আমি এই গুপ্তধনের আশায়

পারশ্য থেকে ছুটে এসেছিলাম। কিন্তু দেখছি আমার শরীরের যা অবস্থা এখন আমি কোনও রকমে দেশে ফিরে যেতে পারলেই বাঁচি।

তবে যদি খুঁজে বার করতে পার আমায় কিছু পাঠিয়ে দিও। বড় আর্থিক কষ্টের মধ্যে বেঁচে আছি আমি ও আমার স্ত্রীপুত্র পরিবার।

এত সহজে একটা গুপ্তধনের হদিস হাতে চলে আসা প্রায় স্বপ্ন দেখার মতোই। কৌতূহল সামলাতে পারলাম না। যাচাই করার উদ্দেশ্য নিয়েই বললাম, তুমি এটা কোথায় পেলে বলবে কি ?

সে প্রথমে হাত দিয়ে তার কপাল স্পর্শ করল। মৃদু হেসে বললে, পারশ্যরাজ নাদির শাহ্-র নাম নিশ্চয়ই তোমার অজানা নয়। আমি সেই নাদির শাহ্-রই বংশধর।

শাহজাহানের মৃত্যুর প্রায় একশত বছর পরে নাদির শাহ্ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেছিলেন। তার প্রবল পরাক্রমের কাছে এদেশের রাজারা হার মেনেছিল। তার কিন্তু এখানে রাজত্ব করার কোনও স্পৃহা ছিল না। ভারতবর্ষ ঐশ্বর্যের দেশ। তাই এখানকার ধনরত্ন লুণ্ঠনের দিকেই তার নজর ছিল বেশী।

সুযোগ উপস্থিত হওয়া মাত্রই তিনি সেদিকেই নজর দিলেন। শাহ্জাহানের বিপুল ঐশ্বর্য তখনও অবলুপ্ত হয়নি।

তৎকালীন ছয় কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মণিমাণিক্য খচিত ময়ূর সিংহাসনসহ প্রচুর ধনরত্ন তার অধিকারে এল।

অত ধনরত্ন নিয়ে যাওয়ার মতো ঝুঁকি তিনি নিলেন না। একমাত্র ময়ূর সিংহাসনটাই তিনি নিয়ে যেতে মনস্থ করলেন।

কিন্তু বাকী ধনরত্ন ? তিনি ভেবেচিন্তে এই যমুনার তীরেই কোনও এক গোপন স্থানে লুকিয়ে রেখে গেলেন।

সে কাজটা তিনি নিজের হাতে করার জন্য, তিনি ছাড়া আর কেউই সে খবর জানল না। তাঁর ইচ্ছে ছিল পরে এক সময় এসে তিনি সেই সব ধনরত্ন স্বদেশে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু নানা কারণেই তা আর সম্ভব হয়নি। তখন এই গুপ্তধনের নক্সা উত্তরাধিকার সুত্রেই আমার হাতে আসে।

মানচিত্র থাকলেও ব্যাপারটা খুব সোজা নয় বলেই আমি এত কাল গা করিনি বা কারুর কাছে ফাঁস করিনি।

কিন্তু সাম্প্রতিক দারিদ্র্যে আমরা বিপর্যস্ত। যদি কিছু পাওয়া যায় তাহলে এই দুরবস্থার অবসান হতে পারে ভেবেই এসেছিলাম এখানে।

এখন মনে হচ্ছে আর দরকার নেই, আমার শেষ সামর্থটুকুও নিঃশেষিত। এতকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়েছি যখন বাকী কটা দিনও পারব।

তাই তোমাকেই এটা দিয়ে যাচ্ছি। আশাকরি তুমি এ সুযোগ সদ্ব্যবহার করবে।

তার এই অনুরোধ আমি রাখলাম বটে কিন্তু আমারই বা সময় কোথায়? তাছাড়া এখানের আমি কতটুকুই বা চিনি, জানি—কালে ভদ্রে তো কাজে আসি।

যাহোক ভাগ্য খুলেছে যখন ফেলবার নয়। তবে এখনি নাই বা খুঁজলাম। পরে সুবিধেমত এ্যাডভেঞ্চারটা করব বলেই রেখে দিয়েছিলাম এটা আমার কাছে।

কিন্তু তা আর হল কই, দেখ পিছন ফিরে—

দেখলাম এক ঝলক আগুন কেবিনের দিকেই দ্রুত এগিয়ে আসছে।

ক্যাপ্টেন করুণ হাসলেন। ফুলদানি আর চিরকুটটা তোমার হাতে তুলে দিয়ে আপাততঃ আমি নিশ্চিন্ত।

যাও আর একমুহূর্ত বিলম্ব নয়। আমার পার্সোনাল লাইফবোট নিয়ে তোমরা ঝাঁপিয়ে পড় বে অব বেঙ্গলে।

কারণ জাহাজটা জলে ডুবতে শুরু করলে তখন তোমাদের লাইফ বোট নিয়ে জলে ভাসাও মুস্কিল হয়ে পড়বে।

তাঁর নির্দেশ আমি অমান্য করিনি। ফ্রেণ্ড এ্যাণ্ড গাইড—তুই-ভাবেই তাঁকে আমি পেয়েছিলাম।

জলে নেমে আমরা জ্বলন্ত সেই জাহাজের দিকে তাকিয়ে রইলাম। ক্যাপ্টেন হাসছেন—আগুনের লাল আভায় তাঁর চোখ তুটো চকচক করছে।

ক্রমশঃ আমরা দূরে সরে যাচ্ছি।

ললিতমোহন নৌকা চালাচ্ছে আর আমি ক্যাপ্টেনকে রুমাল নাড়ছি।

এবার বোধহয় জাহাজখানা ডুবতে শুরু করেছে। একটা প্রচণ্ড শব্দ ভেসে আসছে সেই সাগরের অন্তিম গহ্বর থেকে।

এতক্ষণ আমরা তুজনে কেউই কথা বলিনি। হয়তো বা কথা বলার মত মনের অবস্থাও ছিল না আমাদের কারুরই।

জাহাজের অস্তিত্ব চোখের সামনে থেকে মুছে যেতে এবার আমি কিছুটা সপ্রতিভ হলাম। ললিতমোহনের দিকে তাকাতেই আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে সে ফুলদানির গায়ে আঁকা রেখাগুলো নিবিষ্ট মনেই নিরীক্ষণ করছে।

আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে ভ্রূ কুঁচকে বললে, দেখছিলাম রুপোটা খাঁটি কিনা।

আমি মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু প্রকাশ করলাম না। 'ও তাই নাকি' বলে তার হাত থেকে সেটা নিয়ে নিলাম এবং আমার কিড ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলাম।

ললিতমোহন বোধহয় একটু অখুশিই হল। হয়তো বা তার চাতুরি ধরা পড়ে যেতে সে বেশ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেল।

এরপর আমি যথেষ্টই সাবধান হয়ে গেলাম। তার ওপর আমার কিছুটা সন্দেহের উদ্রেক হল বলেই ফুলদানি এবং তার নকশাটা যথাসম্ভব আগলে রাখবার চেষ্টা করলাম।

ললিতমোহন বরাবরই খুব ধূর্ত প্রকৃতির। দেখলে, এভাবে নিজেকে বার বার ধরা দিয়ে লাভ নেই। সে নানাভাবেই এ প্রসঙ্গে কথা তুলতে লাগল এবং ওই লেখাটা দেখবার চেষ্টা করতে লাগল।

সব চোরকে পার আছে কিন্তু ঘর চোরকে পার নেই। আমি বললাম, তুমিও যেমন। গুপ্তধন না ছাই! কবে কে না কি রেখে গেছে এখনও কি তা পড়ে থাকবে।

সত্যিকারের কিছু থাকলে কেউই এত উদারতা দেখাত না। ও নিয়ে আর চিন্তা না করাই ভালো। তার চেয়ে বরং এখন তীরে কিভাবে তরী ভেড়ানো যায় সেই চেষ্টাই করা যাক্।

ললিতমোহন ঘাড় নাড়ল বটে, কিন্তু কথাটা যে তার মনঃপূত হল না সেটা তার আচরণেই বোঝা গেল।

হঠাৎ নৌকার দাঁড়টানা বন্ধ করে দিয়ে সে বললে, হাতের শিরায় টান ধরেছে। এবার তুমি দাঁড় টান। আমি হাল ধরি।

আমি কোনও রকম ইতস্ততঃ না করেই সে কাজে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

ললিতমোহন সঙ্গে সঙ্গেই তার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করল। হাল ধরার মুহূর্তে এমনভাবে নৌকাটাকে দোলাল, আমি টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেলাম জলে!

সে সঙ্গে সঙ্গেই চিৎকার করে উঠল। আমি আঁৎকে উঠলাম। কারণ আমার কোটের ভেতর পকেটেই কালি দিয়ে লেখা সেই গুপ্তধনের নকশাটা ছিল।

চিৎসাঁতার কাটতে কাটতে আমি পকেট থেকে সেটা বার করে নিলাম। একহাতে সেটা শূন্যে তুলে ধরে আর একহাতে সাঁতার কাটতে লাগলাম।

ললিতমোহন ধরে নিয়েছিল ওই চিরকুটে নির্ঘাত জল লেগেছে। এবং যেহেতু সেটা কালিতে লেখা, জলে পড়ে তা অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সহানুভূতি তার উথলে উঠল। হাত বাড়িয়ে দিল সে আমাকে জল থেকে টেনে তোলার জন্য।

ঘটনাটা অভিসন্ধিমূলক বুঝলেও আমি আমার আচরণে তা বুঝতে দিলাম না। তার হাত ধরেই উঠে এলাম নৌকার ওপরে।

ললিতমোহন অবশ্য তার কৃতকর্মের জন্য দুঃখ প্রকাশ করল আমার কাছে।

সুযোগ মত আমি সেই সংকেত আক্ষরিত চিরকুটটা খুলে দেখলাম। সেটা ভিজলেও কোন ক্ষতি হয়নি। কারণ যে কালি দিয়ে তা লেখা হয়েছিল তা সাধারণ কালি নয়। চাইনীজ ইঙ্ক জাতীয়

কিছু হবে। ইতিমধ্যে জাহাজ ডোবার খবর ছড়িয়ে পড়ার ফলে সাহায্যকারী মেলা জাহাজ আসতে শুরু করেছিল চারদিক থেকে।

তারই একটিতে আমরা উঠে পড়ে সে যাত্রা রক্ষা পেয়ে গেলাম।

ললিতমোহন কিন্তু এত সহজে ছাড়বার পাত্র ছিল না। সে প্রায় ছায়ার মতোই আমার পেছনে লেগে রইল।

আমার অজান্তে আমার জামাপ্যান্টেও হাত ঢোকাতে সে ছাড়েনি। কিন্তু আমি সেটা লুকিয়ে ফেলাতে সে তার উদ্দেশ্যে সফল করতে পারেনি।

এরপর তার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। দুজনে চলে গেলাম দুটো ভিন্ন জাহাজে। আমাদের মধ্যে আর কোনও রকম যোগাযোগ রইল না।

সংসার ধর্ম আমি করিনি। করারও কোনও ইচ্ছে ছিল না। চাকুরিতে যা আমি বেতন পেতাম, হেসে খেলেই আমার দিন কেটে যেত।

তাই গুপ্তধনের নক্সা হাতে আসা সত্ত্বেও, আমার মধ্যে কোনও চাঞ্চল্য আসেনি। ঠিক করেছিলাম চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণের পর তখন এই এ্যাডভেঞ্চারে পা বাড়াব। পেলে ভাল না পেলেও ক্ষতি কিছু নেই।

কিন্তু এতদিন এই নক্সা আর তার সংকেতটা বহে নিয়ে বেড়ানোই এক বিড়ম্বনা।

তাই এই কালীমন্দির গড়ার পরিকল্পনা। ভাবলাম একটা

কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তার তলদেশে যদি এই গুপ্তধনের নকশা আর সংকেতটা লুকিয়ে রাখি, সহজে এটা কারুর হস্তগত হবে না।

কারণ দেবী বিগ্রহ উচ্ছেদ ব্যাপারটি সকলেই অকল্যাণকর বলেই ধরে নেয়।

এ কাজ যদি আমার দ্বারা কোনও কারণে সম্ভব নাও হয়, ভবিষ্যতে যার হাতেই এটা পড়বে সে যাতে নির্বিঘ্নে এই গুপ্তধনের সন্ধানে বেরুতে পারে, তার জন্যই নকশা সমেত রুপোর ফুলদানির পেছনে সংকেতটাও রেখে দিচ্ছি। আশা করি এমন সুবর্ণ সুযোগটা আমি না পারলেও কেউ না কেউ সদ্ব্যবহার করবেই।

এইখানে লেখাও শেষ, পাতাও শেষ।

প্রায় এক নিঃশ্বাসেই জ্যাঠামশায়ের স্বীকারোক্তিটা আমি পড়ে ফেললাম।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল নিভামাসির কথা। অক্ষম ললিতমোহন বাবুই কি তাহলে সেদিন নিভামাসিকে পাঠিয়েছিলেন এই গুপ্তধনের হদিসটা হাতাবার জন্য।

যদি তাই না হয় কেনই বা তিনি সেদিন ফুলদানিটা নিয়ে যেতে চাইলেন। কেনই বা আমার অনুপস্থিতিতে নিভামাসি আলমারি ঘাঁটতে গেলেন।

অবশ্য সবটুকুই আমার কাছে অনুমান মাত্র।

কাগজটা ভাঁজ করা মাত্রই পেছন থেকে কে যেন বলে উঠল, বাবলুদা, এটা আপনার জ্যাঠামশাইয়ের হাতের লেখা নাকি ?

আচমকা এই কণ্ঠস্বরে চমকে উঠলাম। পেছন দিকে চোখ ফেরাতেই চোখাচোখি হল নিভামাসির পয়লা নম্বর বিটলে ছেলে লাট্টুর সঙ্গে। আমার পেছনে দাঁড়িয়ে লাট্টু বড় বড় দাঁত বার করে হাসছে।

লাট্টুর সঙ্গে আমার এমন কিছু পিরিত নেই। কালেভদ্রে দু' একটা কথাবার্তা হয় বটে কিন্তু সেটাও নেহাতই প্রয়োজনে।

তার নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে আমার পেছনে দাঁড়িয়ে থাকাটা আমার ভাল ঠেকল না। সে যে কোনও বদ মতলব নিয়ে আসেনি বা জ্যাঠামশাইয়ের স্বীকারোক্তির মধ্যে গুপ্তধনের সাংকেতিক শব্দ পড়ে নেয়নি কে বলতে পারে।

মুখে বেশ বিরক্তি প্রকাশ করেই বললাম, কী ব্যাপার, তুমি হঠাৎ!

সে আবার দাঁত বের করে হাসল। হাত কচলাতে কচলাতে বললে, মা বললে মন্দিরের ভেতর কী যেন একটা পাওয়া গিয়েছে, সেটাই দেখতে এলাম।

তার কথা শুনে রাগে আমার গা রী-রী করে উঠল। বললাম, এটা তো সরকারী সম্পত্তি নয়, যা পেয়েছি সবাইকে ঢাক পিটিয়ে দেখাতে হবে। নেহাতই পারিবারিক ব্যাপার। এটা কি তোমার দেখতে চাওয়া উচিত?

না না, তা কেন। লাট্টু অকারণ হাসির মাত্রাটা হঠাৎ বেশ কয়েক ধাপ বাড়িয়ে দিল। তারপর কাজের ছুতো করে সরে পড়ল।

লাট্টু চলে যাবার পর আমি জ্যাঠামশাইয়ের ওই স্বীকারোক্তিসহ

ফুলদানিটা যথাসম্ভব এক গোপন স্থানে সুরক্ষিত করলাম। যেভাবে একের পর এক ওদের হানা শুরু হয়েছে এটা বেহাত হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

লাট্টুকে জানলা দিয়ে তখনও দেখা যাচ্ছিল। বেশ দ্রুত গতিতেই সে হেঁটে চলেছে।

জানলায় দাঁড়িয়ে তাকে দেখতে দেখতে হঠাৎ মনে হল, আর তো মাস খানেক বাদেই পরীক্ষার ফল বেরুবে। পরীক্ষা যখন ভালো দিয়েছি, পাশ করব নিশ্চয়ই। কিন্তু তারপর তো চাকুরির সন্ধানে অফিসে অফিসে ধর্না দিতে হবে। ইতিমধ্যে যদি গুপ্তধন প্রাপ্তি যোগ ঘটে যায়—! পাই আর না পাই চেষ্টা চরিত্র করে দেখতে ক্ষতি কি? কিছু না পারি একটা বড় দেখে ব্যবসাও তো ফাঁদা যাবে।

হঠাৎ মনে মনে খুব উৎসাহিত হয়ে উঠলাম। না, এ এ্যাডভেঞ্চার কিছুতেই ছাড়ার নয়। কিন্তু আমার একার দ্বারা কি সম্ভব? শত্রুর তো অভাব নেই। তাছাড়া সেই অচেনা অজানা জায়গায় গিয়ে ওই নকশা অনুযায়ী জায়গা খুঁজে বার করাও তো রীতিমত কঠিন কাজ।

হঠাৎ যেমন উৎসাহিত হয়ে উঠেছিলাম, হঠাৎই তেমন নিরুৎসাহিত হয়ে পড়লাম। গুপ্তধনের লোভে পড়ে শেষ পর্যন্ত কি প্রাণটা খোয়াব!

না, একার পক্ষে এ কাজ কিছুতেই সম্ভব নয়। যদি কাউকে দোসর পাওয়া যায় তাহলেও নয় চেষ্টা করা যেতে পারে।

এমন আবোল-তাবোল অনেক কথাই ভাবছি হঠাৎ কে যেন খট্ খট্ করে কড়া নাড়তে লাগল।

এমন অসময় কে আবার আসতে পারে ভেবে পেলাম না।

কপাট খুলতেই বিল্টুর সঙ্গে চোখাচোখি হল। বিল্টু আমার প্রাণের বন্ধু। ক্লাস ওয়ান থেকে আমরা একই স্কুলে পড়ছি। কলেজে অবশ্য ছাড়াছাড়ি হয়। ও যায় কমার্স স্ট্রীমে, আমি সায়েন্সে।

কিন্তু তাতে আমাদের ঘনিষ্ঠতা কিছুমাত্র কমেনি। কলেজ যেতাম আমরা একই সাথে আবার ফিরতামও প্রায় একই সাথে।

মাঝের কিছু সময় কেবল ভিন্ন হয়ে যেতাম।

বিল্টুকে বেশ খুশি খুশিই দেখাচ্ছিল। ও অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই একটু বেপরোয়া প্রকৃতির হওয়ার জন্য মুখ গোমড়া থাকতে বড় একটা দেখিনি। সিনেমায় ওপেনিং শোতে টিকিট কাটা থেকে শুরু করে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের প্রতিটা খেলায় লাইন দেওয়া, পাড়ার মড়া পোড়ানো ইত্যাদি সব বীরত্ব-ব্যঞ্জক ব্যাপারেই সে পাড়ার শিরোমণি ছিল।

সে কারণে তাকে নিরুৎসাহ থাকতে বড় একটা দেখা যেত না। একটা না একটা হুজুকে সে নিজেকে জড়িয়েই রাখত।

আমিই প্রথম নিস্তব্ধতা ভাঙলাম। বললাম, কিরে মুখ দেখে কিছু একটা সমাচার আছে মনে হচ্ছে?

রাইট ইউ আর মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড, সে হাসল। একটা দারুণ উপহার পেয়েছি। বলতো সেটা কী হতে পারে?

এও এক ধরনের কঠিন পরীক্ষা। যদিও এ প্রশ্নের উত্তর সঠিক না দিলে কোনও ক্ষতি নেই, তাহলেও সঠিক বলার ইচ্ছেটা সকলকেই অল্প-বিস্তর বিব্রত করে তোলে।

আমার এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। রীতিমত চোখ বুজেই সেটা ভাবতে শুরু করে দিলাম। সেটা কিইবা হতে পারে।

ওর একটা বন্দুকের ভীষণরকম সখ ছিল জানি। প্রায়ই সেকথা বলত সে আমার কাছে।

একটা বন্দুক পেলে সে বাঘ শিকারের সখটা মিটিয়ে নেবে জীবনে। জিম করবেটের বাঘ শিকারের সব পদ্ধতিগুলোই তার কণ্ঠস্থ। এখন বন্দুকের ট্রিগারখানা স্পর্শ করতে পারলেই হয়।

কিন্তু বন্দুক বললেই তো আর বন্দুক পাওয়া যায় না। সে তার বাবাকে একবার বলেছিল, কিন্তু এটাকে নিছকই পাগলামি বলেই তিনি উড়িয়ে দিয়েছিলেন। শেষ ভরসা কাকা। কাকা ডি. এস. পি। কাকাকে ধরেছিল জানি—

ভেবেচিন্তেই তাই বললাম, কি বন্দুক!

বিল্টু আমার দিকে চেয়ে মুচকি হাসল। পারলি না তো, অবশ্য পারাটা খুবই শক্ত। কারণ আমি যা চেয়েছি তা পাইনি। যা চাইনি তাই পেয়েছি। অর্থাৎ ট্রেণ্ড আপ একটা পুলিশ কুকুর।

অক্সন হয়েছিল। কাকা কিনে আমাকে উপহার দিয়েছেন।

কুকর প্রাপ্তির সংবাদে আমি অবশ্য খুশি হবার তেমন কোনও কারণ দেখলাম না। তাছাড়া কুকুরে আমার ভয়ও সাংঘাতিক।

ছেলেবেলায় একবার কুকুরে কামড়েছিল। তেরোখানা ইঞ্জেকসন ঢুকেছিল তলপেটে।

সে ব্যথার কথা মনে হলে এখনও আমার বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করে ওঠে।

আমি তাই আমতা আমতা করে বললাম, বন্দুক পেলে নয় শিকারের সখ মেটাতিস। কুকুর নিয়ে কি করবি রে ?

কেন ? বিল্টুর চোখ ছুটো গোল গোল হয়ে উঠল। পুলিশ কুকুর সম্বন্ধে তোর কোনও ধারণাই নেই তাহলে।

এরা মানুষেরও বাড়া। মানুষের কাছে যা অসাধ্য এরা তাই-ই করতে পারে।

বাড়ি পাহারা দেওয়া থেকে শুরু করে অপরাধী খুঁজে বার করা, এমনকি শিকারেও এরা পাকা।

পাড়ায় এখন কোনও অপরাধ ঘটলে সকলে এখন আমারই শরণাপন্ন হবে।

এটা কি কম গৌরবের কথা। তু-ইই বল না—

বিল্টু যে এতখানি ভেবে ফেলেছে, আমি তা অনুমান করতে পারিনি।

প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে নেওয়ার জন্য প্রশ্ন করলাম, তা তো হল, কিন্তু স্যাকৃরেদের নাম কি দিলি ?

নাম ? বলিস কিরে ? নামেরও একটা প্যানেল হয়েছে। এপর্যন্ত পনেরোটি নাম এসেছে। এর থেকেই বেছে নিতে হবে। তবে তোর যদি কোনও নাম সাজেস্‌সান থাকে দিতে পারিস।

আমি না হেসে পারলাম না। বললাম থাক্‌, প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে আর লাভ নেই।

বিল্টু হাসল। কি করছিস বাড়িতে বসে। চল না কুকুরটা দেখে আসবি।

আমি না বলতে পারলাম না।

বিল্টুদের বাড়ি আমাদের বাড়ি থেকে পঞ্চাশ গজের মতো। স্যাণ্ডেলটা পায়ে গলিয়ে গেলাম ওর সাথে।

ওদের বাড়ির সামনে একটা ছোটখাট জটলা সৃষ্টি হয়েছে। আসলে পুলিশ কুকুরের নামে সবাই দেখতে এসেছে তাকে।

আমরা গিয়ে ওদের পেছনে দাঁড়ালাম। জেড ব্ল্যাক আস্‌লি গ্রে হাউণ্ড। গড়ন পাতলা কিন্তু স্বভাবে অত্যন্ত ছটফটে। চোখ দুটো লালচে, ধূর্ততায় ভরা।

সমবেত দর্শকদের দিকে সে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এবং দ্রুত পায়ে পায়চারি করছে।

গলায় মোটা শিকল বাঁধা থাকার জন্য অবশ্য ভয়ের কোনও কারণ ছিল না।

আমি বিল্টুর দিকে তাকিয়ে বললাম, তোকে মনিব বলে চিনেছে ?

বিল্টু ঘাড় নাড়ল। সবে তো কাল এসেছে। এর মধ্যে কি আর চেনে, দাঁড়া দুদিন খাওয়াই পরাই—

ইতিমধ্যে একটি দুরন্ত শিশু দর্শক একটা ইঁটের টুকরো তাকে লক্ষ্য করে ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে উত্তেজিত হয়ে এমন একটা লাফ মারল, প্রায় তার ঘাড়েই উঠে পড়েছিল। কিন্তু চেনটাই এ যাত্রা বাঁচিয়ে দিল তাকে। বাধা পেয়ে আক্রোশে ফুঁসতে লাগল এবার কুকুরটা।

বিল্টু তাকে টেনে নিয়ে এসে বেঁধে রাখল সুমুখে তাদের বারান্দার রেলিংএ। আমাকে বললে, চল ঘরে বসে খানিকটা আড্ডা মারা যাক।

আমি অবশ্য সাথে সাথেই সম্মতি জানালাম।

বিল্টু তাদের চাকর নকুলকে ডেকে দু'কাপ গরম চায়ের ফরমাস দিল। আমরা দুজনেই তার খাটের ওপর হাত পা মেলে বসলাম।

চা এর সঙ্গে টাও এল।

বিল্টু একটা গরম সিঙ্গাড়া তুলে নিয়ে তাতে কামড় বসিয়ে বললে, এটা তোর কপালে খেলাম। তুই এসেছিস শুনেই মা এটা পাঠাল। নচেত আসত না।

'তাই নাকি' বলে আমি একটা সিঙ্গাড়া তুলে নিলাম।

প্রায় গোগ্রাসে সিঙ্গাড়াটা গলাধঃকরণ করল সে। আর একটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, পরীক্ষার ফল বেরুতে এখনও একমাস দেরি। বসে বসে আর পারা যায় না। চল কোথাও গিয়ে একটা এ্যাডভেঞ্চার করে আসি।

বিল্টুর প্রস্তাব শুনে আমার হাসি পেল। এ্যাডভেঞ্চার মানে তুই কি বলতে চাইছিস?

বিল্টু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললে, এই ধর সুন্দরবনে একটা চক্কর মেরে এলাম বা এভারেস্টে দু'চারশ ফুট উঠলাম বা পায়ে হেঁটে এখান থেকে পাঞ্জাব চলে গেলাম, এমন একটা কিছু আর কি।

আমি বললাম, তার চেয়েও বেশি এ্যাডভেঞ্চারাস যদি কিছু করার সুযোগ এনে দিই যাবি?

নিশ্চয়ই। বল না কি? আমি তো পা বাড়িয়েই আছি!

আমি বললাম, যদি একটা গুপ্তধনের হদিস দিই যাবি সেখানে?

গুপ্তধন! বলিস কি রে! সে তো গল্পের বইতেই পড়েছি। এ আবার, সত্যি হয় নাকি?

হ্যাঁ, হবে না কেন। তবে ক'জনের ভাগ্যে আর তা মেলে বল্। মিললেও তারা চেপে যায়। কে জানে, কে কখন শত্রুরা করে বসে।

বিল্টু একমিনিট কি যেন ভাবল। হঠাৎ উল্লসিত হয়ে বললে, সত্যিই তোর কাছে কোনও হদিস আছে নাকি ?

আমি ঘাড় নাড়তেই বললে, সিরিয়াস্‌লি বলছিস !

বিল্টু লাফিয়ে উঠল চেয়ারের ওপর। আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বললে কোথায় ? আমরা যেতে পারব তো ?

আমি তার হাত ছাড়িয়ে বললাম, বলছি। তুই স্থির হয়ে বোস।

বিল্টু আমার কথা মতোই নিজেকে সংযত করল।

চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে আমি শুরু করলাম। বিল্টু হাঁ করেই গিলতে লাগল আমার কথাগুলো।

সংক্ষেপে বললেও, ঘড়ির কাঁটা এক পাক ঘুরে এল শেষ করতে।

হঠাৎ পাশের জানলায় চোখ পড়তে আমি চমকে উঠলাম। জানলার গরাদের ঠিক নিচেই কার যেন মাথা দেখা যাচ্ছে !

কে রে ? বলার সঙ্গে সঙ্গেই সেটা সরে গেল। আমি তাড়াতাড়ি দৌড়ে গেলাম সেদিকে।

সেখানে পৌঁছে কিন্তু আর কাউকে দেখতে পেলাম না। একবার মনে হল হয়ত বা ভুল দেখলাম।

আবার মনে হল ভুল হওয়ার তো কোনও কারণ নেই। স্পষ্টই তো মাথাটা চোখের সামনে থেকে সরে গেল।

এদিকে বিল্টু সব শুনে এমনই অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল এসব কিছুই সে টের পেল না।

আমি জানলার কাছ থেকে ফিরে আসার পর তার টনক নড়ল। বলল, হঠাৎ তুই ওভাবে দৌড়ে গেলি কেন? কেউ যাচ্ছিল নাকি?

একবার মনে হল ঘটনাটা তাকে খুলেই বলি। আবার মনে হল যদি আমার দৃষ্টিভ্রম হয়ে থাকে, মিছেই ওকে বিভ্রান্ত করা হবে।

তাই প্রসঙ্গটা ওইখানেই চাপা দিলাম। যদিও আমার মনের ভেতর খচখচ করতে লাগল।

আমি সংক্ষেপে বললেও, যতটুকু বলেছি বিল্টুকে, সেটুকু শুনলেও গুপ্তধন উদ্ধার করার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের অজান্তেই হয়ত হাতের লক্ষ্মী পায়ে চলে যাবে।

বিল্টু প্রথম দিকে একটু ঝিমিয়ে পড়লেও হঠাৎ আবার সে মুখর হয়ে উঠল। বেশ ভারিক্কি চালেই বলল, এ চান্স কোনক্রমেই মিস্ করা যাবে না। বাবলু তুইও তৈরী হ'। আর হ্যাঁ ওই ফুলদানির নক্সাটা আর সংকেতটা আমার কাছে দিয়ে যাস। একটু স্টাডি করতে হবে। বেরিয়ে পড়লে তো আর ওসব ভাবনা সম্ভব নয়।

আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

সেদিন ব্যাগটা হাতে নিয়ে যখন বিল্টুদের বাড়ির সামনে দাঁড়ালাম, ভেতরে কুকুরের খুব জোর ট্রেনিং চলেছে।

বিল্টু অনবরতই ধমক দিয়ে দিয়ে কি যেন শেখাচ্ছে তার সাকরেদকে।

ট্রেনিং কি ধরনের হচ্ছে জানার জন্যই দাঁড়িয়ে রইলাম বাইরে। কিন্তু সম্ভব হল না। কপাটের নীচের ফাঁকা অংশ দিয়ে আমার পা দেখা যাচ্ছিল। সাকরেদের চোখে তা পড়া মাত্রই তুমুল চিৎকার জুড়ে দিল।

বিল্টু কপাট খুলেই আমাকে দেখে হেসে ফেলল। বলল, কিরকম ট্রেনিং দিচ্ছি! চলবে তো?

আমি ঘাড় নেড়ে বললাম নাম সিলেক্ট হয়েছে?

বিল্টু ঘাড় নেড়ে বলল, এভরিথিং কমপ্লিট। তবে দিশি নাম নয়। পুলিশে থাকাকালীন ওর নাম বব্ ছিল।

ওই নামটাই বহাল রইল। কারণ নতুন নামে অভ্যস্ত হতে অনেক সময় লেগে যাবে। আমাদের তো অপেক্ষা করার সময় নেই।

বিল্টুর বুদ্ধির প্রশংসা না করে আমি পারলাম না। বললাম, ভালোই করেছিস।

আমি ঘরে ঢুকতেই ও কপাট রুদ্ধ করল। বললে, দেখি কি মাল মশলা এনেছিস।

ব্যাগ খুলে আমি রুপোর ফুলদানিটা টেবিলের ওপর রাখলাম। অতঃপর সেই সাঙ্কেতিকটা অতি সন্তর্পণে বার করলাম জামার গোপন পকেট থেকে।

ফুলদানিটা তুলে নিল সে টেবিলের ওপর থেকে। তার গায়ে আঁকা নক্সাটা গভীর মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করতে লাগল।

দেখতে দেখতে হঠাৎ 'হুম' বলে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সে। বলল, খুব পাকা হাতের কাজ। কতদিন আগেকার কিন্তু দেখে কি বোঝার উপায় আছে! এক তিল ফাঁকি নেই।

দাঁড়া এক কাজ করা যাক। এটাই যখন আমাদের মানচিত্র এটা নিয়ে ঘোরা ঠিক হবে না। এর একটা নকল তুলে ফেলি। আমার মনে হয় তাতে আমাদের বাড়তি সুবিধা মিলবে।

কথাটা মন্দ বলেনি সে। আমি তাকে নিষেধ করলাম না। বরং তাকে উৎসাহিত করলাম!

বিল্টু ঘর থেকে তার ড্রয়িং খাতা আর আঁকার বাক্সটা নিয়ে এল। এবং খুব সযত্নে ফুলদানির গায়ে আঁকা রেখাচিত্রটি আঁকতে শুরু করল তার খাতায়।
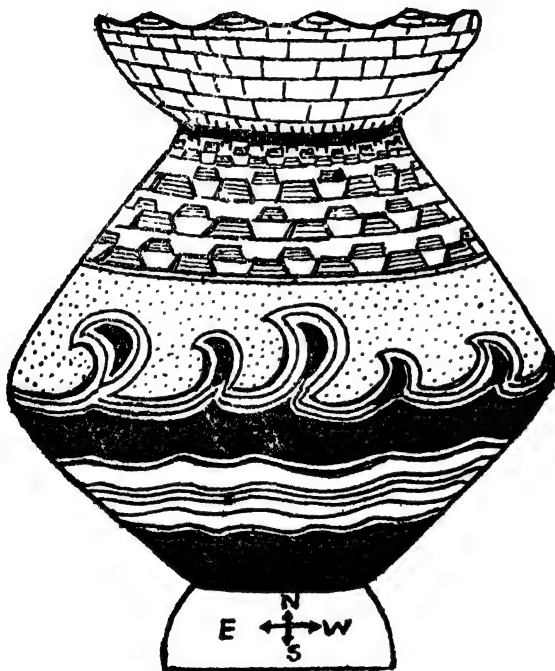
আঁকার হাত ওর চিরকালই ভাল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে ফুলদানি সহ তারগায়ের রেখা চিত্রটি হুবহুনকল করে ফেলল খাতায়। এবার খাতা আর ফুলদানিটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললে, ঠিক এঁকেছি কিনা এবার মিলিয়ে দেখে নে।

খুব সর্তক দৃষ্টি রেখেই আমি চোখ বোলালাম। মনে হল যেন কার্বন কপি করেছে ওই ফুলদানির গায়ের রেখাচিত্রটা।

মেলানো শেষ হতে বিল্টু আমার হাত থেকে খাতাখানা টেনে নিয়ে বললে, ফুলদানিটা আমি রাখছি না। ওটা তুই নিয়েই যা। ওটা রেখে আর কি হবে এখানে।

তবে ওই সাঙ্কেতিকাটা থাক আমার কাছে। দেখা যাক ওর কোনও অর্থ উদ্ধার করতে পারি কিনা।

লেখাটা মোটামুটি পড়া যাচ্ছিল। হুবহু প্রতিলিপিটা এইরকম :

যনা নর ধা, আফোর দনে এবিত প্রাব। গুগু এলে বিনরে যে কর পবে তাগা মর মাআ। কর খুঁলে এটা কন দেতেপা। কন খুলে এটা মার পুল দেতেপা।

এ পুলে পেআ মিবে গুধ।

পর পর বেশ কয়েক বার পড়ল বিল্টু! ভ্রূ কুঁচকে বললে, এক বর্ণও তো বুঝতে পাচ্ছি না। কিরে তুই কিছু আন্দাজ করতে পাচ্ছিস নাকি ?

আমি ঘাড় নাড়লাম। ওটা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাইনি। সময় আর কখন পেলাম বল।

তবে আমার মনে হয় ফুলদানির গায়ে আঁকা ছবিটার সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে হয়ত বা কিছুটা অর্থ উদ্ধার করা যেতে পারে। কারণ সেই উদ্দেশ্যেই তো নক্সা এবং এই সাঙ্কেতিকীটা একসঙ্গে রেখে গেছে।

বিল্টু আমার কথা শুনলেও চোখ ছিল তার লেখার ওপর।

অর্থাৎ মুখে বললেও নিজের অক্ষমতাটাকে সে কিছুতেই পুরোপুরি মেনে নিতে পাচ্ছিল না।

আমার বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে বললে, হয়েছে। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তো যমুনা নদীর ধারেই তার দেখা হয়েছিল। তাহলে ধরে নেওয়া যেতে পারে গুপ্তধনটা যমুনা নদীর ধারেই কোথাও লুকানো আছে।

ফুলদানির নিম্নাংশে জলের ঢেউই অলঙ্করণ করা হয়েছে। অর্থাৎ স্থানটি যে কোনও নদীরধারে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

এখানেও দেখ গোড়াতেই আছে—'য না' অর্থাৎ আর 'য ন'-এর মাঝে যদি 'মু' বসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে যমুনাই হয়।

আমি বিল্টুর বুদ্ধির তারিফ করে বললাম, তা নয় বুঝলাম। কিন্তু শুধু যমুনা নদী আবিষ্কার করলেই তো সব হল না। বাকী শব্দগুলো-কেও তো উদ্ধার করতে হবে।

বিল্টু 'হুম্' বলে আবার সে তাতে মনোনিবেশ করল। পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই আবার সে 'হয়েছে' বলে চিৎকার করে উঠল। আমি বললাম, যেমন—

বিল্টু বলল, চাবি আবিষ্কার করে ফেলেছি আর চিন্তা নেই। আমি বললাম, চাবি বলতে—

সে হাসল। এখানে প্রতি শব্দের মধ্য বর্ণগুলো লোপ করা আছে। যাতে একমাত্র যোগ্য লোকেরাই এর সন্ধান পেতে পারে বা এই সৌভাগ্যের অধিকারী হতে পারে।

আমি অবশ্য ইতিমধ্যেই বেশ আশান্বিত হয়ে উঠেছিলাম। বললাম পরবর্তী শব্দটা তাহলে কি হবে?

সে বেশ গম্ভীর হয়েই বললে, 'যমুনা নর' আছে। অর্থাৎ 'ন' আর 'র'-এর মাঝে যদি 'দী' বসাই তাহলে কথাটা দাঁড়ায় যমুনা নদীর।

এখন ফুলদানির গায়ে কি কি ধরনের নক্সাচিত্র আছে সেটাই আগে দেখা প্রয়োজন।

কারণ সেটা জানা থাকলে এই সাঙ্কেতিক শব্দগুলো উদ্ধার করা অপেক্ষাকৃত সহজই হবে।

কথাটা মন্দ বলেনি বিল্টু। দুজনে গভীর মনোযোগ সহকারে ফুলদানির গায়ে চোখ বোলাতে লাগলাম।

এবার আমার পালা। বললাম চিত্রের উপরিভাগ দেখে, দুর্গের ছবিই মনে হচ্ছে। নীচে যদি যমুনা হয় তাহলে পাশাপাশি আগ্রা ফোর্ট হওয়াই স্বাভাবিক।

সূচনাটা মোটামুটি এইরকম ঃ যমুনা নদীর ধারে আগ্রা ফোর্টের দক্ষিণে....

বিল্টু ঘাড় নেড়ে বললে, রাইট। এখন দেখা যাক পরের অংশ।

দুজনেই পরের অংশ কি হতে পারে ভাবতে শুরু করলাম।

আমি বললাম, বিন্দুগুলো কি হতে পারে ?

বিল্টু বললে, কঠিন প্রশ্ন। ছবি দেখে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। তবে ওসব জায়গায় মাটির স্তূপ ছাড়া আর কীই বা আছে ?

আমি কিন্তু বিল্টুর সঙ্গে একমত হতে পারলাম না। বললাম, আমার মন কিন্তু গোরস্থান বলছে।

ওটা মুসলমান প্রধান এলাকা। গোরস্থান থাকাই তো স্বাভাবিক। আর গোরস্থান ধরলে শব্দেও মেলে।

বিল্টুর চোখ দুটো চকচক করে উঠল। বললে, পর পর যেভাবে

আমরা শব্দগুলো উদ্ধার করছি, সম্পূর্ণটা উদ্ধার করতে আমাদের খুব বেশী সময় লাগবে না বলেই মনে হচ্ছে।

যাহোক থামলে চলবে না। আয় আবার শুরু করি।

এক একটা শব্দ উদ্ধার হয় আর আমরা দুজনে হৈচৈ করে উঠি।

অবশ্য অত্যুৎসাহে ভুল যে না হচ্ছিল তা নয়, এমন এক একটা উদ্ভট শব্দ সৃষ্টি হচ্ছিল যার কোনও মানেই হয় না বা মানে হলেও কোন সঙ্গতি রক্ষা হচ্ছিল না।

বেশ কিছুক্ষণ কঠোর পরিশ্রমের পর পুরোটারই অর্থোদ্ধার হল। দাঁড়াল এইরকম :

যমুনা নদীর ধারে আগ্রা ফোর্টের দক্ষিণে এক বিস্তৃত প্রান্তর। মাঝামাঝি এক গোরস্থান। গুনে গুনে এগুলে বিশ নম্বর যে সমাধি পড়বে গায়ে তার মড়ার মাথা আঁকা। গোরস্থান খুঁড়লে একটা কফিন দেখতে পাবে। কফিন খুললে একটা মাটির পুতুল দেখতে পাবে।

পুতুলের পেটে আছে গুপ্তধন।

বিল্টু বার বারই সেটা পড়ল এবং প্রায় কবিতার মতই মুখস্থ করে নিতে লাগল।

আমাকে বললে, চিরকুটটা আপাততঃ আমার কাছেই থাক। আমরা মোটামুটি একটা অর্থোদ্ধার করেছি বটে, কিন্তু ভুলও হতে পারে।

এখন থাক্ পরে ধীরে সুস্থে আবার দেখা যাবে।

আমার কোনও আপত্তির কারণ ছিল না। একা একা গুপ্তধন খুঁজে বার করার মত মানসিক প্রস্তুতি আমার ছিল না। বিল্টুকে সবরকম সহযোগিতা করতে আমি প্রস্তুত।

ফুলদানিটা যেহেতু রাখতে চায়নি বিল্টু নিজের কাছে, ওটা আমি ব্যাগে পুরে বাড়ির পথে রওনা দিলাম। কথা রইল পরের দিন তার বাসাতেই আবার আমরা মিলিত হব।

বিল্টু দরজা পর্যন্ত আমায় এগিয়ে দিয়ে গেল। হাসতে হাসতে বললে, একটু সাবধানে চলা-ফেরা করিস। গুপ্তধন হাতে না পাস নক্সাটার মালিক তো বটেই। সেই বা কজনের ভাগ্যে জোটে!

আমি তার সঙ্গে হ্যাণ্ডশেক করে বেরিয়ে পড়লাম।

পথে বেরিয়ে বেশ একটু সর্তক হয়ে হাঁটছি। কেউ আমার ব্যাগের দিকে তাকালে সঙ্গে সঙ্গেই আমি তার দিকে তাকাচ্ছি। যেন ছিনতাই করার সাহস তার না হয়।

কিছু পথ এইভাবে হাঁটার পর নিজের অজান্তেই আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছি। হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল।

আমার দুচোখে কে যেন গুঁড়োর মতো কি একটা বস্তু ছিটিয়ে দিল। আর সঙ্গে সঙ্গেই চোখের মধ্যে এক অসহ্য যন্ত্রণা শুরু হল।

দু' চোখে আমি সরষে ফুল দেখতে লাগলাম। মনে হল আমি বুঝি এখুনি অন্ধ হয়ে যাব।

ঘটনাটা সম্পূর্ণই অপ্রত্যাশিত হওয়ার জন্য, আমি কয়েক মুহূর্ত নীরব থাকার পর সাহায্যের জন্য আবেদন করতে লাগলাম পথচারীর কাছে।

কিন্তু ইতিমধ্যেই আমার হ্যাণ্ড ব্যাগে টান অনুভব করলাম। ধরে রাখার চেষ্টা করলাম বটে একহাতে কিন্তু পারলাম না। সে ছিনিয়ে নিল আমার হাত থেকে।

সব জেনে শুনেও তখন আমার করার মতন কিছুই ছিল না। সে বোধহয় ব্যাগ নেওয়ার পর এবার আমার জামার পকেট হাতড়াতে শুরু করল।

তার হাতটা দু' একবার ধরে ফেলেছিলাম বটে, কিন্তু সে ঝটকা মেরেই নিজেকে মুক্ত করে নিল।

তন্নতন্ন করেই সে কিছু একটা খুঁজল আমার পোশাকের মধ্যে। হঠাৎ আমার গালে ঠাস করে একটা চড় মেরে সে যাত্রা রেহাই দিল আমাকে।

সে যে দৌড়ে পালাল সেটা আমি তার পদশব্দ শুনেই বুঝে নিলাম। কিন্তু আমার পক্ষে তখন হাহুতাশ করা ভিন্ন আর কোনও গত্যন্তর ছিল না।

•

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গিয়েছে। অন্ধের মতই আমি হাতড়ে বেড়াচ্ছি চারদিকে। কোন দিকে যে আমার বাড়ির পথ তাও বোঝা দুরূহ হয়ে দাঁড়াল আমার পক্ষে।

হঠাৎ দূরে বিল্টুর গলা শুনতে পেলাম।

মনে হল যেন বিল্টু এই যেন দিকেই আসছে।

মনে একটু ভরসা পেলাম। সাগ্রহেই অপেক্ষা করতে লাগলাম তার জন্য।

বিল্টু আমার কাছে এগিয়ে এসে বেশ উত্তেজিত হয়েই বললে, কীরে একি ব্যাপার! তোর চোখে আবার কি হল ?

চোখে সত্যিকারের কি পড়েছে আমিও তখন জানি না। বললাম, সর্বনাশ হয়ে গেছে।

চোখে এখন কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। ব্যাগটা খুলে দেখত ভেতরে ফুলদানিটা আছে কি না।

বিল্টু বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁপিয়ে পড়ল ব্যাগের ওপর। ব্যাগের মুখটা বড় রকমের ফাঁক করা। ভেতরে ফুলদানির নাম গন্ধ নেই। টুকিটাকি আর যে সব জিনিসপত্তর ছিল সেগুলোও ঘাঁটা। অর্থাৎ এই মুহূর্তে যে কেউ সেগুলো নাড়াচাড়া করেছে, তা দেখলেই বোঝা যায়।

বিল্টু দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বলল, সতর্ক করে দিলাম তাও রাখতে পারলি না। শত্রু ইতিমধ্যেই সক্রিয় হয়েছে আমাদের পেছনে। অর্থাৎ আমাদের কার্যকলাপ ও গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে।

যাহোক নক্সাটা হাতছাড়া হয়নি, এটাই আজ আমাদের ভাগ্য বলে মনে হচ্ছে। চল ওসব পরে হবে। এখন তোর চোখ দুটোর পরিচর্যা করা যাক। চোখ হারালে আর অনুশোচনার শেষ থাকবে না।

বিল্টুর হাত ধরেই আমি এগুচ্ছিলাম। সে নীরবেই চলছিল।

আমি প্রশ্ন করলাম, তুই আমার বিপদের কথা জানলি কি করে ?

বিল্টু সশব্দে হাসল। এ ফ্রেণ্ড ইন নিড্ ইজ এ ফ্রেণ্ড ইনডিড। তাছাড়া এইটুকুই যদি জানতে না পারি, তাহলে বড় কাজে সফল হব কি করে।

বিল্টুর এ মন্তব্যের কোনও জবাব না দিতে, এবার সে কানে কানে বলল, পাড়ার শম্ভু কাকা এই পথ দিয়েই ফিরছিল। তোর এই দুর্দশা দেখে সে দৌড়ে গিয়েই খবর দিয়েছে আমাকে।

আমি অবশ্য এই ধরনের ঘটনার জন্য ইতিমধ্যেই তৈরী ছিলাম। শোনামাত্রই তাই দৌড়ে এলাম। কিন্তু পাখি তো উড়ে গিয়েছে। কাজের কাজ কিছুই হল না। যাহোক, আমরা ডাঃ সোমের ডিস-পেনসারীতে পৌঁছে গিয়েছি। এখন কি করণীয় ডাঃ সোমের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখি।

ডাঃ সোম আমার চোখ পরীক্ষা করে বললেন, লঙ্কাগুঁড়ো বলেই তো অনুমান হচ্ছে। ভয়ের কিছু নেই। বেসিনে গিয়ে চোখদুটো ভাল করে ধুয়ে এস। আমি একটা ড্রপ দিচ্ছি। তিন ঘণ্টা পাঁচ-ফোঁটা করে চোখে দিলেই, চোখ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ডাঃ সোমের নির্দেশমত আমি চোখ ধুলাম সেখানে। চোখে পাঁচফোঁটা ওই লোশন পড়তেই মনে হল আগুনে যেন জল পড়ল।

মোটামুটি সুস্থ হতে, বিল্টু আমাকে বাড়িতে এগিয়ে দিয়ে ফিরে গেল তার বাসাতে।

পরের দিন সাত সকালেই সে এসে হাজির। যথারীতি কুশল বিনিময়ের পর বলল, কাল নক্সাটা রেখে এসেছিলিস ভাগ্যিস। ফুলদানিটা চুরি করে নিয়ে গেছে বটে, কিন্তু ওই সাঙ্কেতিকীটা পায়নি তো। ওই নক্সা দেখে নিশ্চয়ই গুপ্তধনের হদিস বার করতে পারবে না। এখন এটাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা।

বিল্টুর সান্ত্বনা বাক্যে আমি কিন্তু মোটেই খুশি হলাম না। নিজেকে যেন আরও বেশি করে অপরাধী মনে হতে লাগল।

বিল্টু আমার মানসিক অবস্থাটা উপলব্ধি করে বললে, ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই বন্ধু। আমরা যখন ফুলদানির গায়ে আঁকা

মানচিত্র রেখে দিয়েছি, আমাদের অসুবিধায় পড়ার কোনও কারণ নেই।

তবে শত্রু সম্বন্ধে আমাদের এখনি আরও সাবধান হতে হবে। যে এই কাজ করেছে সে যে আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। হয়তো বা পদে পদেই সে আমাদের বাধা দেবে এমনকি প্রাণনাশেরও চেষ্টা করবে কিন্তু আমাদের ভয় না পেয়ে এগিয়ে যেতেই হবে।

অন্ততঃ এ্যাডভেঞ্চারের ইতিহাসে সেই কথাই স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে।

বিল্টুর কথা শুনে আমি হারানো মনের জোরটুকু যেন ধীরে ধীরে আবার ফিরে পেতে শুরু করলাম।

থানায় ডায়রী করা নিয়ে বিল্টুর সঙ্গে আমার একটু মতভেদ হল। থানা পুলিশ করার ইচ্ছে আমার একেবারেই ছিল না। কিন্তু বিল্টু চাইল ঘটনাটা পুলিশে ডায়েরী করার জন্য।

কিভাবে পুলিশকে জানানো হবে, সে দায়িত্ব বিল্টু নিজের কাঁধে নিতে আমি তাকে বাধা দিলাম না।

থানায় ঢুকতেই ও. সি. বিনয়বাবু আমাদের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বললেন, কী ব্যাপার? চুরি না ডাকাতি?

যেহেতু দায়িত্বটা বিল্টুর ওপরেই চাপানো ছিল, তাকেই ঠেলে দিলাম প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়ার জন্য।

বিল্টু বেশ একটু গম্ভীর হয়ে গিয়ে বললে, কাল যখন থানার পেছন দিক্‌কার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম আকস্মিক এক দুর্বৃত্ত চোখে

লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে ব্যাগ থেকে একটা রুপোর পাত্র ছিনতাই করে নিয়ে পালিয়েছে।

জিনিসটা এমন কিছু মূল্যবান নয় ঠিকই, কিন্তু অত্যন্ত স্মৃতি-বহুল। যদি এটা আপনারা ধরতে পারেন, তাহলে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বিনয়বাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, এ এলাকায় ছিনতাই? স্ট্রেঞ্জ! আমি তো গত পাঁচবছর এই থানায় রইছি কই এরকম অভিযোগ তো কখনও পাইনি।

তাছাড়া যারা এই ধরনের চুরি ছিনতাই করে, তাদের নাম ঠিকানাও আমাদের কাছে লেখা আছে।

তাদের কেউ এই এলাকায় ঢুকেছে বলে তো খবর নেই।

আমি বললাম, নতুন কেউও তো এ পথে নামতে পারে।

বিনয়বাবু আমার মুখের দিকে একটু ভ্রূ কোঁচকালেন। ন-তু-ন? ক্রিমিনালকে আপনারা দেখেছেন। তার কাজ দেখে কি আনাড়ি মনে হয়েছে আপনাদের একবারও?

জল ঘোলাটে হবার উপক্রম দেখে বিল্টু উত্তর দেবার দায়িত্ব নিজেই নিল।

সে বললে, যেভাবে সে ছিনতাই করেছে, তাতে মনে হয়েছে সে খুব অভ্যস্ত নয় এব্যাপারে। অভ্যস্ত হলে তার কাছে নিদেন পক্ষে একখানা পেন্সিলকাটা ছুরি বা ছোরাও থাকত।

সে বাজারের একপ্যাকেট গুঁড়ো মশলা দিয়েই বাজীমাৎ করে দিয়ে গেল।

বিনয়বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, হ্যাঁ এটা একটা পয়েন্ট বটে।

আচ্ছা এই ক্রিমিনালকে আগে কখন দেখেছেন কিনা ভেবে দেখুন তো ?

আমি ঘাড় নাড়লাম। চোখে লঙ্কাগুঁড়ো থাকার ফলে তাকে দেখতেই পাইনি।

ছাটস অল! বলে বিনয়বাবু ডায়েরীতে কি যেন খস্‌খস্‌ করে লিখতে লাগলেন।

লিখতে লিখতে হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, আচ্ছা আপনাদের অপহৃত ওই ফুলদানিব গায়ে আঁকা বা লেখা কিছু ছিল ?

আমি আমতা আমতা কবছি দেখে, বিল্টু বলল, হ্যাঁ ছিল। কিছু কারুকাজ ছিল তবে তাব যথাযথ বর্ণনা দেওয়া এখন শক্ত।

তিনি লিখে নিলেন খস্‌খস্‌ করে তাঁর ডায়েরীতে। এবার আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, পারব বলে কথা দিতে পাচ্ছি না বটে তবে উই শ্যাল ট্রাই আওয়ার বেস্ট।

আমরা দুজনেই দাঁড়িয়ে পড়েছি। হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। নিভামাসির পয়লা নম্বর বিটলে ছেলে লাট্টু বেশ ঝড়ের বেগেই ঘরে ঢুকল এবং মিঃ চৌধুরীকে কি একটা বলাব জন্য এগিয়ে গেল কিন্তু হঠাৎ আমার চোখে চোখ পড়ে যেতেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল।

আমায় দেখে সে যে খুশি হল না স্পষ্টই বুঝতে পারলাম তার মুখ দেখে। তবে সেটা কয়েক-মুহূর্তের জন্য।

তারপর কিছু না বলে কয়েই বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। যাবার মুহূর্তে বিনয়বাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে একবার মুচকি হাসল মাত্র।

লাট্টু বেরিয়ে যাবার কয়েক মুহূর্ত পরেই আমরা বেরোলাম। কিন্তু ততক্ষণে লাট্টু চলে গিয়েছে সেখান থেকে।

পথে নেবে বিল্টু বললে, কী ব্যাপার বলত? লাট্টু ঝড়ের মত এলই বা কেন আবার বেরিয়েই বা গেল কেন? কোনও কাজে এসেছিল বলেতো মনে হল না।

আমি বললাম, কি জানি কোন বদ উদ্দেশ্য আছে বলেই তো মনে হল। এই নাটকের গুরু ওই নয়তো?

থানা থেকে আমরা সোজা চলে এলাম বিল্টুদের বাড়ি।

বাইরে থেকে বিল্টুর গলা শোনা মাত্রই বব্ ঘেউ ঘেউ করে ডেকে উঠল। নাম ধরে বিল্টু তাকে ডাকতেই সে লাফিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে এবং তার সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল।

বিল্টু বললে দাঁড়া তোকে একটা খেলা দেখাই। তুই তোর রুমালটা আমায় দিয়ে বাড়ির ভেতরে লুকিয়ে থাক। দেখ বব্ তোর রুমালের গন্ধ শুঁকে গিয়ে কেমন করে তোকে খুঁজে বার করবে।

এই ধরনের গল্প আগে আমি অনেক শুনেছি। কিন্তু চাক্ষুষ দেখার সুযোগ আমার কখনও ঘটেনি।

বিল্টু বলা মাত্রই আমি যথাযথ তার নির্দেশ অনুসরণ করলাম।

লুকোলাম গিয়ে বিল্টুর গডরেজের আলমারিটার পেছনে। ওদিকে বিল্টুর কাছ থেকে আদেশ পাওয়া মাত্র বব্ ঘরে ঢুকে চারদিক শুঁকে শুকে বেড়াতে লাগল তারপর হঠাৎ লাফ মেরে আলমারির পেছনে এসে আমার হাতটা আলতো করে কামড়ে ধরল এবং বিল্টুর কাছে টেনে নিয়ে যেতে লাগল।

আমার অসহায় অবস্থা দেখে বিল্টু না হেসে থাকতে পারল না। বললে, বন্ধু কিরকম মালুম হচ্ছে? কাজ চলবে তো?

আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছিল না। নিছক খেলা জানলেও বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছিল। আমি নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে মুক্তি প্রার্থনা করলাম তার কাছে।

বিল্টু ডাকতেই, বব্ আমাকে মুক্তি দিয়ে ফিরে গেল তার কাছে।

বব্‌কে বেঁধে রেখে বিল্টু আর আমি গিয়ে বসলাম ওদের ঘরেতে। বিল্টুর মা ঘরে কি যেন করছিলেন। আমাকে দেখে মৃদু হেসে বললেন, এই যে বাবা এসেছ।

সেদিন যেন রাস্তায় কি হয়েছিল ? তোমার নাকি কি একটা জিনিস কেড়ে নিয়ে গিয়েছে।

আমি 'হ্যাঁ' বলে শুরু করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বিল্টু ইশারায় আমাকে টিপে দিল।

সঙ্গে সঙ্গেই আমি একথা সেকথা বলে প্রসঙ্গটা পালটে ফেললাম।

বিল্টুর মা অন্দরমহলে চলে যেতে বিল্টু বেশ একটু বিরক্তি প্রকাশ করেই বলল, তুই আমাদের সব প্ল্যান ভেস্তে দিবি দেখছি। ছ্যাখ্ এসব ব্যাপারে কাউকেই বিশ্বাস করা চলবে না। মা আমাদের শত্রু না হতে পারে কিন্তু অজান্তে শত্রুর কাছে আমাদের উদ্দেশ্য ফাঁসিয়ে দিতে তো পারে।

এতে যে শুধু গুপ্তধনই আমাদের হাতছাড়া হবারই আশঙ্কা আছে তা নয়, প্রাণনাশও কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

তাছাড়াও আর একটা কথা আছে।

গুপ্তধনের জন্য আমরা যে পাড়ি জমাবার কথা ভাবছি সেটাও যথাসম্ভব গোপন রাখতে হবে আমাদের। কারণ দুটো। প্রথমতঃ আমাদের বাড়ির অভিভাবকেরা এ ধরনের দুঃসাহসিক অভিযানকে নিশ্চয়ই সমর্থন করবেন না। দ্বিতীয়তঃ যদি অন্য কারুর এ গুপ্তধনে লোভ থাকে সে আমাদের এই অভিযানকে নানাভাবেই ব্যাহত করবার চেষ্টা করবে।

অতএব বুঝতেই পারছিস—অনেক ভেবেচিন্তেই এখন আমাদের কথা বলা দরকার।

বিল্টুর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মাসীমা ঢুকলেন পাঁপর ভাজার প্লেট হাতে নিয়ে।

পাঁপর ভাজার খবর আগেই পৌঁছে গিয়েছিল। দুজনে কেউই তাই অবাক হলাম না। মাসীমা প্লেটটা টেবিলে বসিয়ে দিতেই একখানা তুলে কামড় বসালাম।

মাসীমা হেসে বললেন, খাও চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

প্রত্যাশিত সময়ের আগেই চা এসে হাজির হল। দিয়ে গেল বিল্টুর ছোট বোন বীথি।

পাঁপর ভাজার সাথে চা-টা ভালই লাগল। তাছাড়া চা-টাও হয়েছিল ভাল।

সশব্দে চেখে চেখে চা-টা আস্বাদন করতে দেখে, বিল্টু মুচকি হাসল। বললে, তারিফ করে যা কিছু খাবার খেয়ে নে। যে ধান্ধায় যাচ্ছি, বলা যায় না স্বর্গারোহণও করতে পারি।

এখন ইচ্ছা পুরিয়ে রাখলে তখন আর আত্মাকে আফসোস করতে হবে না।

এতো তলিয়ে আমি কিছুই ভাবিনি। বিল্টু প্রসঙ্গটা তুলতে আমি একটু গম্ভীরই হয়ে গেলাম।

চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিতেই, বিল্টু হেসে বললে, ফর ইওর ইনফরমেশন এভরিথিং ইজ রেডি। এমন কি দুটো রিভলবারও!

রিভলবারের নামে আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। বললাম, তার মানে? সেটা আবার কার কাছ থেকে পেলি?

সে হাসল। বললে, বিনা বাধায় আমরা গুপ্তধন পাব বলে বিশ্বাস করি না। বাধা আমাদের নানা দিক থেকেই আসবে। অন্ততঃ আমার মন সেরকমই বলছে।

সে ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার জন্য রিভলবার অপরিহার্য। তবে আশঙ্কার কোনও কারণ নেই। টয় রিভালবার রাখব বলেই স্থির করেছি।

—টয় রিভলবার দিয়ে কি আত্মরক্ষা করা যাবে? আমি তাকালাম ওর মুখের দিকে।

সে হেসে বলল, টয় নামেই! ওই যে রে হাইজ্যাক করার সময় দেবেন পাণ্ডে ব্রাদার্স যা ব্যবহার করেছিল।

আসলের চেয়েও ওর ফিনিশিং ভাল। ওই কোম্পানীতেই চিঠি লিখেছি দুটো ভি-পিতে পাঠিয়ে দেবার জন্য।

এই এসে পৌঁছল বলে!

তলে তলে যে বিল্টু এত দূর এগিয়ে গিয়েছে আমি কিছুই জানতে পারিনি। মনে মনে তাই আমি উৎসাহিত হয়ে উঠলাম।

বিল্টু ইতিমধ্যে পকেট থেকে একখণ্ড কাগজ বার করে কি কি জিনিস নিতে হবে ফর্দ করতে বসল।

আমি প্রশ্ন করলাম, কি কি নিবি তার তো ফর্দ হচ্ছে। কে কে যাবে স্থির করেছিস।

বিল্টু মুখ তুলল না। সে পূর্বের মতোই কাগজে আঁকজোক কাটতে কাটতে বলল, তুই আমি আর বব্ এই হল মোট আড়াইজন। এর বেশী নেওয়া কি উচিত হবে? গুপ্তধনের ব্যাপার তো, যতোই সংখ্যা বাড়বে ভাগাভাগি নিয়ে ঝগড়াঝাঁটির সম্ভাবনাও ততো বেশী। যেটা আদৌও আমরা চাই না।

আমরা দুজন থাকাই ভাল। পাই আর না পাই ঝগড়াঝাঁটির কোনও সম্ভাবনা থাকবে না।

বিল্টুর যুক্তিটা হয়তো বা নীতিগত দিক দিয়ে ভালোই, কিন্তু আমার মন স্পর্শ করল না।

বিদেশ বিভুঁয়ে একটু দলভারী থাকলেই বোধ হয় মনের জোর বেশী থাকে।

তাছাড়াও কতরকম আপদ বিপদ আছে, দু'জনে একসাথে ঘায়েল হলে তখন কেইবা কাকে দেখবে। একমাত্র ভরসা বব্। কিন্তু যতোই বিশস্ত হোক সে জানোয়ার তো বটেই। কতটুকুই বা তার ক্ষমতা।

এ প্রসঙ্গে আর বিশেষ কথা বাড়ালাম না। বললাম, বেশ তাই হোক। মোটামুটি কবে নাগাদ আমরা যাত্রা করব সেটাই এখন ঠিক করা দরকার।

বিল্টু যেন কী একটা উত্তর দিতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল। লাফিয়ে উঠে গেল চেয়ার ছেড়ে জানলার দিকে।

কিছু যে অশুভ ইঙ্গিত সে পেয়েছে, এ বিষয়ে আর কোনই সন্দেহ রইল না আমার।

আমিও পেছন পেছন তাকে অনুসরণ করলাম।

জানলার বাইরে দুটো লোক নিজেদের আড়াল করে, ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা কইছে।

আমরা দুজনে গিয়ে জানলায় দাঁড়াতেই তারা মাথা নামিয়ে নিল এবং আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করতে লাগল।

এমনভাবে তারা নিজেদের আড়াল করে রেখেছিল আমরা অনেক চেষ্টা করেও তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

বিল্টু কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ল। তারা কে এবং কেন এই জানলার নীচে আশ্রয় নিয়েছে জানার জন্য সে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

আমাদের সেখানে উপস্থিতি টের পেয়ে তারা পালিয়ে যাবার চেষ্টা করা মাত্রই বিল্টু আহ্বান করল বব্‌কে।

বব্‌ ঘরের চৌকাঠের ধারে শুয়ে, চৌকাঠটা কামড়ে ধরে দাঁতের শক্তি পরীক্ষা করছিল।

বিল্টুর কাছ থেকে আহ্বান আসা মাত্রই সে লাফিয়ে এল সেখানে।

বিল্টু তাকে তুলে ধরে জানলা দিয়ে দেখাল লোক দুটোকে। তারপর পাকড়ো শব্দটা উচ্চারণ করার সাথে সাথে, বব্‌ তার কোল থেকে এক লাফে বেরিয়ে গেল ঘরের বাইরে।

বিদ্যুৎ গতিতেই সে উঠোন পেরিয়ে বাড়ির সীমানা পাঁচিলটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর একলাফে পেরিয়ে গেল সেটা।

বিল্টু আর আমি অবশ্য ঘুর পথেই সেখানে গিয়ে হাজির হলাম। বব্‌ ইতিমধ্যে তাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে সমানে গর্জন করে চলেছে।

আমরা সেখানে উপস্থিত হতেই তাদের সঙ্গে আমাদেরও চোখাচোখি

হল। দুজনকেই আমরা চিনি। ওরা নিভামাসীর ছেলে লাট্টুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু জগা আর ভেটু।

লেখাপড়া বিশেষ করেনি। দিনরাত চায়ের দোকানে আড্ডা মারে আর মস্তানি করে বেড়ায়।

ইদানীং ছিনতাইয়ের ঘটনাতেও তাদের নাম শোনা যাচ্ছে এবং প্রায়ই পুলিশ এদের পিছু ধাওয়া করছে।

আমাদের দেখা মাত্রই তারা হাবভাব পাল্টিয়ে হাসতে হাসতে আমাদের দিকে চেয়ে বলল, দশটা টাকা হারিয়েছে। আপনাদের কারুর চোখে পড়েনি?

টাকা হারিয়েছে? বিল্টু একটু বিস্ময় প্রকাশ করে আমার দিকে তাকাল। কানের কাছে মুখটা এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললে, দেখছিস চট্ করে কিরকম একটা ফন্দী এঁটে ফেলেছে!

সে ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, এতো জায়গা থাকতে তোমাদের টাকাটা এখানে পড়ল কী ব্যাপার? ঘটনাটা তো ঠিক বুঝে উঠতে পাচ্ছি না।

জগা যেন কী বলতে য্যাচ্ছিল। ভেটু বাধা দিল। বললে, টাকাটা ঠিক আমাদের নয়।

আমারই এক ভাগ্নে স্কুলের মাইনে নিয়ে যাবার সময় পকেট থেকে পড়ে গিয়েছে। বাড়িতে গিয়ে কান্নাকাটি করছে। তাই আমরা এসেছিলাম খুঁজতে।

মিছেই খুঁজলাম। কই চোখে পড়ল। তাহলে বোধহয় অন্য কোথাও ফেলেছে।

য্যাহোক্ আপনাকে বলা রইল। যদি আপনাদের কারুর চোখে

পড়ে অনুগ্রহ করে রেখে দেবেন। আমরা বরং পরে আপনার কাছ থেকে নিয়ে যাব।

কথাগুলো প্রায় এক নিঃশ্বাসেই উচ্চারণ করে জগা আর ভেটু সরে পড়ল সেখান থেকে।

এদিকে বব্ এসে আমার পা চাটছিল। বিল্টু ববের গলায় আঁটা বকলেসে চেনটা লাগিয়ে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে বললে, কি বুঝলি?

সত্যি কথা বলতে কি আমি এত তলিয়ে কিছুই বোঝার চেষ্টা করিনি। একবার মনে সন্দেহ উঁকি মেরেছিল বটে কিন্তু যে মুহূর্তে ওরা টাকা হারাবার খবরটা শোনাল তখন এর ওপর আর বিশেষ গুরুত্ব দিইনি।

বিল্টুর প্রশ্ন শুনে একটু বিব্রত হলাম। বললাম, কেন তুই কি কিছু গন্ধ পাচ্ছিস নাকি?

পাব না? বলিস কিরে? তুই দেখছি একেবারে সত্যযুগের লোক?

বিল্টুর অভিযোগ শুনে আমি একটু ঘাবড়িয়েই গেলাম। একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়ে বললাম, ওরা কি তাহলে···

একজ্যাক্ট্‌লি। ওদের টাকা-ফাকা হারায় নি। দেখলি না ওই কটা কথা বলতে কতবার ঢোক গিলল।

আসলে ওরা এভাবে ধরা পড়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি। কিন্তু সেই ভাবনা অসার প্রমাণিত হতেই ওরা চট্ করে এই গল্পটা বানিয়ে ফেললে। এবং সেটা বলার ফলেই তাদের এত সহজে আমাকে মুক্তি দিতে হল।

অর্থাৎ মুঠোর মধ্যে পেয়েও তাদেরকে আমায় ছেড়ে দিতে হল। ঘরে পাঠাবার সুযোগ মিলল না।

মোটামুটি এবার ঘটনাটা আমার কিছুটা বোধগম্য হল। ওদের ঘরে ফিরে এসে যথারীতি একটা চেয়ার দখল করে বসে বললাম, এই গুপ্তধন আবিষ্কারের পথে আমরা দুজনেই যখন অভিযাত্রী তখন আমাদের ধ্যান ধারণাটা মোটামুটি একইরকম হওয়া উচিত।

এখন তোর অনুমানটা বল দেখি আমার সঙ্গে কতটা মেলে।

আমার আগ্রহ দেখে বিল্টু বোধহয় একটু খুশীই হল। টেবিলে পা দুটো তুলে দিয়ে, মৃদু হেসে বললে, এই গুপ্তধন সম্পর্কে আমার আজ পর্যন্ত যে ধারণা হয়েছে তা হল এই :

তোর জ্যাঠার বন্ধু ওরফে ললিত মেসো অক্ষম হয়ে পড়লেও যেইমাত্র ফুলদানি প্রাপ্তির সংবাদ শুনলেন তখনই স্ত্রীকে পাঠালেন তোকে ধাপ্পা দিয়ে নক্সাটা হাতিয়ে নেবার জন্য।

কিন্তু যেহেতু তুই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছিলিস, মাসী বিশেষ সুবিধা না করতে পেরে ফিরে গেলেন এবং পয়লা নম্বরের বিটলে ছেলে লাট্টুকে লাগালেন আমাদের পেছনে।

লাট্টু কিন্তু খুবই চতুর এবং লোভী। সে তীক্ষ্ণ নজর রাখার ফলে স্পষ্টই বুঝে ফেলেছে, তোতে আর আমাতে মিলে দল গড়েছি এ ব্যাপারে। কাজেই আমাদের দেখাসাক্ষাৎ এবং গোপন শলা-পরামর্শের ওপর দৃষ্টি রাখা একান্ত প্রয়োজন।

প্রথম প্রথম সে তাই করেছিল কিন্তু পরে যখন বুঝল তার একার দ্বারা আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা সম্ভব নয়, তখনই তার দুই বন্ধু যথাক্রমে জগা ও ভেটুকে আমাদের পেছনে লাগিয়েছে।

আমরা এখন কে কোথায় আছি না আছি, কি কথা বলছি, কি শলা-পরামর্শ আঁটছি সবই ওরা নখ দর্পণে রাখতে চায়।

ফুলদানিটা তারাই ছিনতাই করেছে। কিন্তু শুধু যে ফুলদানির নক্সা দেখে গুপ্তধন খুঁজে বার করতে পারবে না এটা তারা ভাল করেই জানে। বিশেষ করে ললিতমোহন বাবুর মত পাকা লোক যখন তাদের পেছনে আছে।

এখন তাই তারা ওই সাঙ্কেতিকীটা আমাদের কাছ থেকে হাতিয়ে নেবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে এবং সে জন্যই মরিয়া হয়ে উঠেছে।

এমনও হতে পারে আমাদের পেছন পেছন ওরাও গুপ্তধনের সন্ধানে রওনা হতে পারে। এমন সুবর্ণ সুযোগটা তারা হেলায় ছাড়বে বলে তো মনে হয় না।

আমি খুব মনোযোগ সহকারেই বিল্টুর বক্তব্যটা শুনছিলাম। ওর কথা শেষ হতে বললাম, ইট্ মে বি—

তালিকা মতোই খুঁটিনাটি জিনিসপত্র যোগাড় হতে লাগল। ছদ্মপোশাক নেওয়া হল একসেট। পোশাকের সঙ্গে কয়েকখানা মুখোশও। যাতে সামনাসামনি পড়লে অন্ততঃ আত্মগোপন করা যায়।

প্রথমে কেবলমাত্র স্যুটকেশ নিয়ে যাওয়াই স্থির হয়েছিল। কিন্তু পরে সে সিদ্ধান্ত পাল্টানো হল।

স্যুটকেশ নিয়ে যাওয়ার বিপদ অনেক। প্রথমতঃ স্যুটকেশ নিলে সেটা রাখার একটা সমস্যা আছে। হোটেল কিংবা কোনও বাড়িতে আশ্রয় না নিলে স্যুটকেশ বহন করাই বিড়ম্বনা।

কিন্তু ঝোলার ক্ষেত্রে সে আশঙ্কা নেই। সেটা নিয়ে যত্রতত্রই থাকা বা যাতায়াত করা যেতে পারে।

আত্মরক্ষামূলক অস্ত্রশস্ত্র বলতে নকল রিভলবার দু'টো ছাড়াও, একটা গুলতি ও ক'টি আছাড়ে পটকা নেওয়া হল।

আমি একটা ছোরা নেবার কথাও বললাম বিল্টুকে। কিন্তু বিল্টু তাতে রাজী হয় নি। চার ইঞ্চির বেশী লম্বা ফলক হলে সেটা আইনের আওতায় পড়ে। আইনভঙ্গকারী কোন কিছুই সে সঙ্গে রাখতে চায় না।

তবে এ ধরনের জিনিসের প্রয়োজনীয়তাটা সে অস্বীকার করতে পারেনি। যে কারণে শেষ পর্যন্ত একটি ছোট ছুরি সে কাছে রাখতে রাজী হল।

সবই যোগাড় হয়ে গেল। যেগুলো আমাদের কাছে ছিল না শেষ পর্যন্ত আটকাল গিয়ে টাকাতে। চেয়ে চিন্তেই আমরা তা যোগাড় করতে লাগলাম।

এই অভিযান সম্পূর্ণ গোপন রাখতে গিয়ে আমরা বাড়িতে পর্যন্ত কাউকে বলিনি। কারণ, আমরা ভালো করেই জানতাম, মা বাবার কাছে এই এ্যাডভেঞ্চারের কথা ব্যক্ত করলে, তারা নেহাতই হৈ চৈ লাগিয়ে পাড়া সরগরম করবেন এবং নানাভাবেই আমাদের অভিযানে বাধা সৃষ্টি করবেন।

যে কারণে আমাদের অভিযান ব্যর্থ হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

আমরা কিছু টাকা যোগাড় করলেও, সবটুকু যোগাড় হয়ে ওঠেনি।

যে জন্য নেহাৎই ভেবে পড়েছিলাম।

কিন্তু সদিচ্ছা থাকলে বোধহয় কিছুতেই আটকাতে পারে না। দুম্ করে তাই একটা রাজ্য লটারীর পুরস্কার মিলে গেল। পেয়ে গেলাম নগদ একহাজার টাকা।

একরকম দৌড়েই সে খবর দিতে গেলাম বিল্টুকে। বিল্টু জানলায় বসে গালে হাত দিয়ে কি যেন ভাবছিল। আমাকে দেখেই সে বেরিয়ে এল বাইরে। বললে, টাকার কিছু সুরাহা করতে পারলি?

আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম মাত্র।

আমার হাবভাব দেখে সেও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়তে যাচ্ছিল। বাধা দিলাম। বললাম—পেয়েছি। মিনি গুপ্তধন। লটারীতে এক হাজার টাকা পুরস্কার। এই দেখ বলে টিকিটটা বাড়িয়ে দিলাম তার দিকে। আজকের কাগজেই লটারীর ফলাফল বেরিয়েছে। আর একবার মিলিয়ে দেখতে পারিস।

বিল্টু ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে কয়েক মিনিট তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ ছোঁ মেরেই সে টিকিটটা হাতে নিয়ে ঢুকে গেল ঘরের মধ্যে। কিছুক্ষণ পরে সে বেরিয়ে এল একরকম নাচতে নাচতেই। ঘাড় নেড়ে বললে, মিলেছে। যাক্, নিশ্চিন্ত হলাম। ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যই।

•

পরের দিনই আমি হানা দিলাম রাজ্য লটারীর অফিসে। আমার সৌভাগ্য দেখার জন্য অল্প বিস্তর ভিড় জমে গেল। কিন্তু টাকার পরিমাণটা জানার পর চুপি চুপি সবাই সরে যেতে লাগল এদিক ওদিক।

ভিড় তখনও খুব একটা পাতলা হয় নি। হঠাৎ পেছন থেকে কে যেন প্রশ্ন করল, দাদা কত টাকা পেলেন?

আমি একটা উইড্র ফর্মে স্বাক্ষর করতে করতেই বললাম, বেশী না মাত্র এক হাজার।

—কি করবেন ঠিক করেছেন নাকি ?

—হ্যাঁ, বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম আছে।

হঠাৎ মনে হল আগন্তুক পেছনে দাঁড়িয়ে এতো প্রশ্ন করছে কেন ? সামনে এলেই তো পারে।

আগন্তুককে দেখার জন্য ঘাড় ফেরাতেই বুকের মধ্যে ছ্যাঁৎ করে উঠল। স্বয়ং লাট্টু দাঁড়িয়ে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে!

কথা না কইলে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয় বলেই আমি প্রশ্ন করলাম, কী ব্যাপার ? এখানে আবার কি প্রয়োজন তোমার!

লাট্টু এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল। মুখে একটা কৃত্রিম গাম্ভীর্যের প্রলেপ মাখিয়ে বললে, লটারীর এজেন্সি নেব। তাই ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

উত্তরটা সে এমন ভাবে দিল, তাকে সন্দেহ করার মতো কোনও অবকাশই রইল না। কিন্তু মনের মধ্যে আমার খচ্‌খচ্‌ করে উঠল। অবশ্য সেটা আমার এই পুরস্কার প্রাপ্তির সৌভাগ্যের জন্য নয়। এই টাকাটা কিভাবে খরচ করব সেটা জানার জন্য তার যে এই অকারণ কৌতূহল।

আর কোনও বাক্য ব্যয় না করেই আমি দ্রুত অফিস ত্যাগ করলাম। মনে হল লাট্টুও যেন আমার পেছু নিয়েছে।

লাট্টুর সঙ্গে আমার এই সাক্ষাৎ কেমন যেন ভাল লাগল না। একবার ভাবলাম ঘটনাটা পুরোই চেপে যাই বিল্টুর কাছে। কারণ বিল্টু শুনলে যে খুশী হবে না সেটা আমি ভালো করেই জানতাম।

কিন্তু এর ফলভোগের তুরাশঙ্কায় আমি সন্ধ্যেবেলায় বিল্টুর সঙ্গে দেখা করে সবই তার কাছে খুলে বললাম।

বিল্টু ঘটনাটা শুনে মোটেই খুশী হল না। গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবতে লাগল। একটা ছোটখাট দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল, দেখ লাটু, তোকে মিথ্যে কথা বলেছে।

রাজ্য লটারীর এজেন্ট মোটামুটি নির্দিষ্টই আছে। হয়তো বা সে কিছু টিকিট বিক্রি করতে চায়। তার জন্য ম্যানেজারের সঙ্গে সাক্ষাতের কি প্রয়োজন? যে কোনও এজেন্টের ঘরে গেলেই তো সে এই সুযোগ পেতে পারে।

তাদের টপকে ওখানে যাওয়া নিতান্তই উদ্দেশ্যমূলক এবং সেই উদ্দেশ্য তোর পেছু নেওয়া ছাড়া আর কিই বা হতে পারে?

অর্থাৎ তুই কি পরিমাণ টাকা পাবি এবং তা দিয়ে কি করবি সেটা জানার উদ্দেশ্যেই, তোর পেছু পেছু রাজ্য লটারী অফিসে হানা দিয়েছিল। আর তোর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে, সে তার মতলবও হাসিল করে নিয়েছে।

আর কিছুই নয়, আমাদের আরও সতর্ক হয়েই পথ চলতে হবে। কারণ ওরা যেভাবে আমাদের পেছনে লেগে রয়েছে, যাত্রাপথে কিছু অঘটন ঘটানো তাদের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব নয়।

যা হোক এ নিয়ে আর গবেষণা চালিয়ে লাভ নেই। টাকা যোগাড় যখন হয়ে গিয়েছে আমরা যে কোন দিনই বেরিয়ে পড়তে পারি। তবে এই কদিন আমাদের একটু সাবধানে থাকা দরকার।

রাত বেশ গভীর। ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল।

পথেঘাটে লোক একরকম নেই বললেই হয়। মাঝে মাঝে দু'একটা ট্যাক্সী যাত্রী নিয়ে যাতায়াত করছে।

ললিতমোহন বাবুকে একরকম ধরাধরি করে এনেই বসিয়ে দেওয়া হল মাঝের খুপরি ঘরটার মধ্যে তার আরাম-কেদারার ওপর।

চশমাটা ভাঁজ করা অবস্থায় ছিল বুক পকেটের মধ্যে। সেটা ধীরে ধীরে বার করে তিনি চোখে লাগালেন।

একটা কাঁচ ঘষা হওয়ার জন্য একটা চোখ ঝাপসা দেখাচ্ছিল। অপর কাঁচের মধ্যে দিয়ে অবশ্য তার অন্য চোখটি দেখা যাচ্ছিল বটে, তবে সে চোখ স্বাভাবিক নয়। প্রতিহিংসায় উজ্জ্বল।

তিনি চেয়ারে বসে নিভা মাসীর কানে ফিস্‌ফিস্ করে কি যেন বললেন।

একটা পেঁচা কুৎসিত স্বরে ডাকতে ডাকতে ওপর দিয়ে উড়ে গেল।

সুমুখের চেয়ারে উপবিষ্ট তিনজন যথাক্রমে লাট্টু, জগা এবং ভেটু নিজেদের মধ্যে গুজগুজ করে কিছু একটা শলা-পরামর্শ করছিল।

ললিতমোহন বাবু তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, আজ কি কোনও উল্লেখযোগ্য খবর আছে ?

লাট্টু ঘাড় নাড়ল।

ললিতমোহন বাবু কিছুটা হতাশ হলেও পুনরায় উৎসাহিত হয়ে উঠে বললেন, ভেবেছিলাম তোমরা ফুলদানিটা যেভাবে বুদ্ধিবলে অপহরণ করেছ, সাঙ্কেতিকীটাও সেইভাবে সংগ্রহ করতে পারবে।

কারণ ফুলদানির গায়ে আঁকা নক্সার মধ্যে গুপ্তধনের ঠিকানা থাকলেও তা খুঁজে বার করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। তার জন্য ওটা একান্তই প্রয়োজন।

এখনও পর্যন্ত সেটার খোঁজ তোমরা বার করতে পারনি। আমার যতদূর মনে হচ্ছে ওই ধূর্ত বিল্টেটাই সেটাকে সরিয়ে ফেলেছে।

এখন তোমরা ভেবে দেখ কি করবে। তার কাছ থেকে ওটা ছলে বলে কৌশলে বার করে নিতে পারবে, নাকি ওটা ছাড়াই গুপ্তধনের খোঁজে বেরিয়ে পড়বে?

প্রশ্নটা যেহেতু তিনজনের উদ্দেশেই রাখলেন তিনি, তিনজনেই একটু নড়ে চড়ে বসল।

প্রথম কথা বলল ভেট্টু। হাত কচলাতে কচলাতে বললে, ফুলদানিটা ছিনতাই করে আমাদের লাভের চেয়ে লোকসানই হয়েছে বেশী। ওরা এখন এতো সতর্ক হয়ে গেছে, গোপনে ওদের ঘরে এখন ঢোকাই শক্ত। আমরা আনাচে-কানাচে ঘুরলেও সে সুযোগ পাচ্ছি না। কারণ ঘরে তালা না লাগিয়ে ওরা এক পাও নড়ছে না।

অবশ্য বিল্টের ব্যাপার স্যাপারই আলাদা। কোত্থেকে একটা বেয়াড়া কুকুর এনে পুষেছে। কুকুর নয়তো যেন বাঘ। এখন ও বাড়ির ত্রিসামানায় ঘেঁষাই শক্ত। তাই আমার মনে হয় অযথা আর আলেয়ার পেছনে না ঘুরে সোজাসুজি আগ্রায় চলে যাওয়াই ভাল। সেখানে গিয়ে লোকের কাছে খোঁজপত্তর করে যদি—

জগা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই আপত্তি জানাল তার মন্তব্যে। বললে, ভেট্টুর বোধ হয় আগ্রা সম্বন্ধে কোন ধারণা নেই। অতবড় একটা শহরে কোথায় গুপ্তধন লুকানো আছে খুঁজে বার করা কি মুখের কথা।

তাছাড়াও ইতিমধ্যে যদি বাবলু সদলবলে সেখানে গিয়ে হাজির হয় তাহলে তো রীতিমত লড়াই বাধবে আমাদের সঙ্গে।

সেই অবস্থায় কি মাথা ঠাণ্ডা করে আমাদের পক্ষে গুপ্তধনের সন্ধান করা সহজ হবে!

আমার তো মনে হয় না। এখন আমাদের লিডার কী বলে!

লাট্টুকে ওরা বরাবরই লীডার বলে ডাকে। লিডার সম্বোধনে তাই লাট্টু সরব হল।

হাতের আঙুলগুলো মটকাতে মটকাতে বললে, ওরা যেভাবে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ঘোরাফেরা করছে, ওরা যেকোনও সময়ে বেরিয়ে পড়তে পারে।

বিল্টুর বাড়ি থেকে এখন ওই সাঙ্কেতিকীটা উদ্ধার করা শক্ত। তবে আমার মাথায় এখন অন্য একটা ফন্দী এসেছে।

লাট্টু একটু থামতে নিভা মাসী কট্ কট্ করে সুপারী চিবোতে চিবোতে বললেন, সেটা কি শুনি?

ললিতমোহন বাবু মাথা ঝাঁকিয়ে পুত্রের দিকে তাকালেন।

লাট্টু আবার সরব হল। বললে, আমার মতে ওদের কাছ থেকে সাঙ্কেতিকীটা যদি এখন আমরা ওটা উদ্ধার করতে নাও পারি তাতে হতাশ হবার কোন কারণ নেই। তাতে দায়িত্ব আমাদের বেড়ে যাবে।

ওরা যখন এই অভিযানে বেরুবে, আমাদের সরাসরিই ওদের অনুসরণ করতে হবে।

আপাততঃ বাড়িতে ঢুকে যে কাজ করা এখন সম্ভব হচ্ছে না, তখন পথেঘাটে ওদের বেকায়দায় ফেলে, ওটা ওদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া খুব বেশী কঠিন হবে না।

তবে সেজন্য অবশ্য আমাদের প্রস্তুতি দরকার। কারণ এই দীর্ঘপথ তাদের পেছু নেওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়।

লাট্টুর কথা শুনে সকলের মুখেই অল্পবিস্তর স্বস্তির ভাব ফুটল। অর্থাৎ নৈরাশ্যের অন্ধকারে কিছুটা যেন আশার আলো দেখল।

ললিতমোহন বাবু চশমাটা খুললেন চোখ থেকে। যে কোন কারণেই হোক চোখটা তার ঈষৎ রক্তবর্ণ।

সকলের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে, চশমাটা পুনরায় চোখে লাগাতে লাগাতে বললেন, এই গুপ্তধন পাওয়ার স্বপ্ন আমার অনেকদিনের। আমি যদি অকালে অক্ষম হয়ে না পড়তাম এ সুযোগ সহজে আমি ছাড়তাম না। প্রয়োজনে আমি প্রাণপাতের সঙ্কল্পও নিয়েছিলাম। কিন্তু বিধি বাম হল বলেই আজ আমি তোমাদের হাতে এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছি।

এই প্রসঙ্গে আমি আর একবাব জগা এবং ভেটুকে মনে করিয়ে দিচ্ছি এই গুপ্তধন যদি তোমরা তিনজন উদ্ধার করতে পার, দুই তৃতীয়াংশ নেব আমরা এবং বাকী এক তৃতীয়াংশের ভাগ পাবে তোমরা দুজনে। অর্থাৎ যতদূর অনুমান টাকার মূল্যে প্রায় আশী-লক্ষের মত। এত টাকা পাওয়া নেহাৎ ছেলেখেলা নয়। এজন্য তোমাদের যেকোনও ঝুঁকি নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

এখন ভেবে দেখ সে প্রস্তুতি তোমাদের হয়েছে নাকি ?

ললিতমোহন বাবুর ক্রূর দৃষ্টি বিশেষ কবে জগা ও ভেটুর মুখের ওপর ঘুরতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ ভেটুর নীরবতা ভাঙল। বললে আর কেউ না হোক, আমি প্রস্তুত। ভেটু সে কথা উচ্চারণ করার সাথে সাথে বাকী দুজনাও ওই একই কথা উচ্চারণ করল।

নিভামাসী হঠাৎ সরব হলেন। বললেন, আমার মনে হচ্ছে

তোমাদের আর একবার হানা দেওয়া উচিত বিল্টের বাড়িতে। এবং সেটা তার অনুপস্থিতিতে এবং ছদ্মবেশে হলেই ভাল হয়।

কারণ ছদ্মবেশে না ঢুকলে ব্যাপক তল্লাসী কোনভাবেই সম্ভব নয়।

এই কথা বলা মাত্রই ঘরের মধ্যে একটা মৃদু গুঞ্জন উঠল। অর্থাৎ প্রস্তাবটা দুঃসাহসিক হলেও, গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হল।

লাট্টু মায়ের মুখের দিকে একবার তাকাল। এবার দৃষ্টি ফেরাল ললিতমোহন বাবুর দিকে। প্রশ্ন করল, তুমি কি বল? এ ঝুঁকি নেব? ললিতমোহন বাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, রিস্কি বাট গুড প্রপোজাল। ট্রাই মাইডিয়ার বয়েজ।

সেদিন ছিল শনিবার।

ভোর থেকেই অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। বিল্টু তাই তার প্রাত্যহিক অভ্যাস মত বব্‌কে বাইরে প্রাতঃকৃত্য করাতে নিয়ে যেতে পারে নি। সে বৃষ্টি ধরার জন্য অপেক্ষা করছিল এবং ঘরে বসে একটা সাদা কাগজে কি যেন আঁকজোক কাটছিল।

বৃষ্টিটা ধরে এসেও ধরছিল না। প্রায় তিনচার বার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েও, আবার সে বসে পড়ল। কারণ বৃষ্টিটা যেমনি হঠাৎ কমে যাচ্ছিল, তেমনিই হঠাৎ বেড়ে যাচ্ছিল।

নিজে গেলে হয়তো বা তাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হত না। ছাতার সাহায্যে অনায়াসেই সে তার কাজ সেরে আসতে পারত। কিন্তু বব্‌কে নিয়ে বেরুনোর জন্যই তার পক্ষে সেটা সম্ভব হচ্ছিল না।

অগত্যা বৃষ্টি থামা পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতেই হচ্ছিল।

বব্ এতক্ষণ তার ঘরেই বসেছিল। এইমাত্র ভেতর থেকে মায়ের ডাক শুনে লাফিয়ে ভেতরে গিয়েছে। প্রতিদিন এই সময়েই তার মা জলখাবার খান আর নিজের খাবারের কিছু অংশ তিনি রোজই দেন বব্‌কে।

তাই সে এই সময়টা চঞ্চল হয়ে পড়ে। মায়ের ডাক শোনামাত্রই সে লাফিয়ে সেখানে হাজির হয়।

এতক্ষণে বোধহয় বৃষ্টি সত্যিই ধরল। কারণ পথে লোক চলাচল বাড়ছে। ছাতা বন্ধ করেও অনেককে হাঁটতে দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে।

বিল্টু বার বার দরজার দিকে তাকাচ্ছে। ওটাই ববের ট্রেনিং। খাওয়া শেষ হলেই সে ভিতরে আসবে তার কাছে।

সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হচ্ছে। বিল্টুর বাবা অফিস বেরুচ্ছেন। দূরে অফিস হওয়ার জন্য তাকে অনেক আগেই বেরুতে হয়। অন্যান্য দিন এর আগেই বেরিয়ে পড়েন। কিন্তু আজ বৃষ্টি পড়ার দরুন, একটু দেরী হয়ে গিয়েছে। তারপর জলে কাদায় দ্রুত পথ হাঁটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার।

দরজায় তার বাবা একমুহূর্ত থমকে দাঁড়ালেন। বিল্টুকে প্রশ্ন করলেন, কোথায় যেন তোরা বেড়াতে যাবি বলছিলিস, গেলি না?

বিল্টু নিমেষের মধ্যে চারপাশের জানলাগুলোর ওপর একবার চোখ বুলিয়ে খাটো গলায় বললে, হ্যাঁ যাব। আগামী সপ্তাহে। বড্ড গরম পড়েছে বলেই অপেক্ষা করছি।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাল ডিসিসানই নিয়েছিস', বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন বিল্টুর বাবা হরিচরণবাবু।

হরিচরণবাবুও চৌকাঠ পেরোলেন বব্‌ও লাফ মেরে ঢুকল ঘরে।

খাওয়াটা বোধহয় আজ তার ভালই হয়েছে। হাবভাব তাই বেশ খুশী খুশীই।

আর সময় নষ্ট করল না বিল্টু। এক হাতে ববের চেন আর এক হাতে স্টিকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সে বাড়ি থেকে এবং গয়লা পাড়ার মাঠ বরাবর অগ্রসর হল। এই মাঠেই সে রোজ তাকে নিয়ে যায়।

সদর দরজা অবশ্য ভেজানোই ছিল। রান্না ঘরে মা থাকার জন্য বিল্টু সে ব্যাপারে আর সাবধান হয়নি। সঙ্গে সঙ্গেই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব ঘটল তাদের সদরে। একজন সার্জেণ্ট আর দুজন হাবিলদার। এদের কারুরই স্বরূপ চেনার কোনও উপায় ছিল না।

তারা কড়া নাড়ল না। সোজা ঢুকে গেল অন্দরমহলে।

বিল্টর মা বসে পান সাজছিলেন। পাছে চুন বেশী পড়ে যায়, এই ভয়ে একেবারেই মুখ তুলছিলেন না।

সার্জেণ্ট প্রথম তার মায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বলল, আপনার ছেলে বিল্ট কোথায় ? তার বিরুদ্ধে আমাদের কিছু অভিযোগ আছে।

আকস্মিক মুখের সামনে পুলিশ দেখে থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগলেন বিল্টুর মা। আমতা আমতা করে বললেন, সে তো বাড়ি নেই বাবা। বাইরে গিয়েছে। এখুনি আসবে।

সার্জেণ্ট বলল, আমাদের অপেক্ষা করার সময় নেই। সে সরকার বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত আছে এই মর্মে গোপন খবর পেয়ে আমরা এসেছি। আমরা এখুনি বাড়ি সার্চ করতে চাই। বিল্টুর জিনিসপত্র কোথায় কি আছে তাড়াতাড়ি বলে ফেলুন। বিল্টুর মা ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ করে তার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। বললেন, আমি তো কিছু জানি না বাবা। তোমরা ইচ্ছা করলে দেখতে পার। তবে

আমি যতদূর জানি সে—বিল্টুর মায়ের অনুমতি পাবার পূর্বেই অবশ্য তারা সার্চ শুরু করে দিয়েছিল। এবার স্বয়ং সার্জেণ্টও যোগদান করল তাদের সাথে।

দশ মিনিট ধরে তোলপাড় করল তারা ঘরগুলো। বিশেষ করে বিল্টুর ঘরে ঢুকেই তারা বই খাতা আলমারি স্যুটকেশ এমন কি ঘুলঘুলিও বাদ দিল না।

উত্তেজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত তারা কয়লা ঘুঁটের ঘরেও ঢুকল। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাদের আসা, সম্ভবতঃ তা সফল হল না। হঠাৎ ত্রিমূর্তি একত্রিত হয়ে কি যেন একটা শলা-পরামর্শ করল। তারপর চকিতে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে।

তারা চলে যাবার পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিল্টু এসে হাজির হল বাড়িতে। ঘরে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়াল। সেলফে যত বইপত্তর ছিল কে যেন ঘেঁটেঘুঁটে একাকার করে দিয়ে গিয়েছে।

বিল্টু প্রথমে ভাবল হয়তো বা সে স্বপ্ন দেখছে। সে দৌড়ল ভিতরে মায়ের খোঁজে।

মাকে দেখে সে অবাক হল। রান্না-বান্না ফেলে, মাথায় হাত দিয়ে তিনি বসে আছেন।

বার বার প্রশ্ন করেও কোন উত্তর পেল না তার কাছ থেকে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

ক্রমশঃ সে যখন বিস্তারিত ঘটনা জানতে পারল তখন আর বিস্ময়ের শেষ রইল না।

স্পষ্টই বুঝতে পারল এই কীর্তিটা কাদের। কিন্তু যেহেতু কোন প্রমাণ নেই তাই করার মতো তার কিছুই ছিল না।

তবে এরই মধ্যে সে মনে মনে মুচকি হাসল একবার। কারণ যে উদ্দেশ্যে তাদের হানা দেওয়া অর্থাৎ সেই চিরকুটটা অক্ষত অবস্থাতেই তার মাথার বালিশের ভেতরে তুলোর মধ্যে অবস্থান করছে।

এদিকে স্নান সেরে আমি যখন ভাতের প্রত্যাশায় বসে আছি হঠাৎ কিড়িং কিড়িং করে কলিং বেল বেজে উঠল।
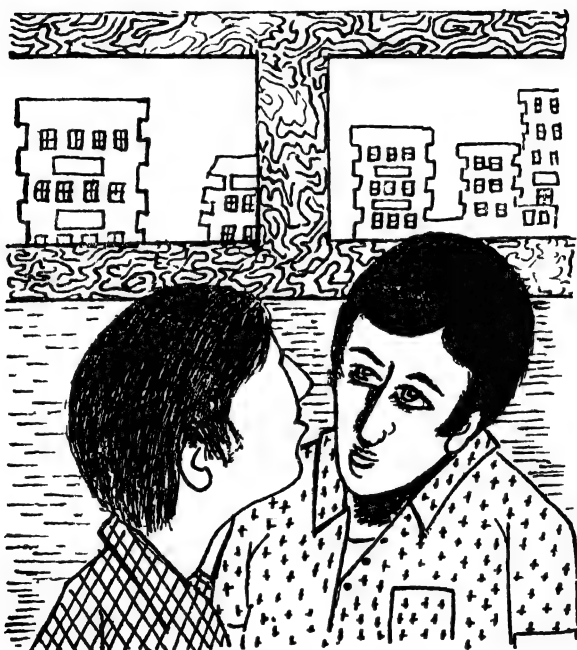
এত বেলায় কার আগমন ঘটতে পারে কিছুতেই মাথায় এল না। কিঞ্চিৎ কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই ছিটকিনি খুলে দিলাম।

বিল্টু ঢুকল বেশ একটু উদ্‌ভ্রান্ত হয়েই। আমাকে দেখে বলল, বী সিরিয়াস। জরুরী কথা আছে তোর সঙ্গে।

এই অবেলায় তার আগমন আমার কাছে ভালো ঠেকেনি। 'বী সিরিয়াস' বলাতে স্বভাবতঃই আমি আরও একটু উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লাম।

ইতিমধ্যে ভাতের থালাও এসে হাজির হল আমার সামনে। বিল্টু সেটা লক্ষ্য করে, এক টুকরো হেসে বললে, তাহলে তুই খাওয়ার পাটটা শেষ করে আয়।

আমি ততক্ষণ ঘরে অপেক্ষা করছি।

মা অবশ্য বিল্টুর গলা পেয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বললেন, এত বেলায় এলে বাবা। বিল্টুর সঙ্গে দু'মুঠো ভাত খেলে হত না। বিল্টু অবশ্য রাজী হল না। আর একদিন খাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সে ঢুকে গেল ঘরেতে।

আমি ডাইনীং টেবিলে বসে নিশ্চিন্ত মনেই ভাতের থালায় মনঃসংযোগ করলাম।

সাধারণতঃ ধীরে ধীরে খাওয়াই আমার চিরাচরিত অভ্যাস। কিন্তু আজকের এই মুহূর্তে হঠাৎ আমি খুব তৎপর হয়ে উঠলাম।

মাথার মধ্যে এক কাল্পনিক দুশ্চিন্তা অনবরতই পাক খেতে লাগল।

একটা যে অঘটন ঘটেছে এটা আমি অনুমান করেই ঘরে ঢুকলাম। বিল্টুর কথায় মিলে গেল তা অক্ষরে অক্ষরে। তবে এতখানি সাহস যে ওদের হবে এটা প্রায় স্বপ্নাতীতই।

বিল্টু বিস্তারিত কাহিনী আমাকে বলার পর বেশ গম্ভীর হয়েই প্রশ্ন করল, তাহলে উপায়? ওরা তো ক্রমশঃই বেড়ে উঠছে। এরপর যে আমাদের গলা কাটবে না এমন ভরসাই বা কোথায়?

আমি বললাম, এটা তুই ঠিকই বলেছিস। ওরা যে গুপ্তধনের লোভে মরিয়া হয়ে উঠেছে এই ঘটনা থেকেই সেটা প্রমাণিত হল।

অতএব আমাদের আর দেরী করা মোটেই উচিত নয়।

বিল্টু বললে, আমি তো তৈরী। শুধু সবুজ সঙ্কেত পেলেই—।

আমি হাসলাম। রেডী থাকলে কি হবে, ওরা কি আর আমাদের রেহাই দেবে নাকি।

নির্ঘাত ওরা আমাদের পেছু নেবে এবং গুপ্তধনটাও নির্বিঘ্নে আমাদের হজম করতে দেবে না।

বিল্টু মাথা নীচু করে কি যেন ভাবতে লাগল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, দি আইডিয়া। আমরা যদি রেলে না যাই কেমন হয়?

এবার আমার অবাক হবার পালা এল। বললাম, এ ছাড়া আর কিভাবে যাওয়া যেতে পারে? প্লেনে নিশ্চয় নয়?

বিল্টু ঘাড় নাড়ল। না, না, প্লেনে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমাদের দুজনকে বাজারে বিক্রি করলেও অতটাকা পাওয়া যাবে না। আমি বলছিলাম কি আমরা যদি নদী পথে যাই—

তার প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেবার মত কোনও যুক্তি খুঁজে পেলাম না। বললাম, কি ভাবছিস একটু খোলাখুলি বলতো।

বিল্টু এক মিনিট নীরব থেকে বলল, তুই ঘণ্টাখানেক বাদে আমার বাড়িতে আয়।

ইতিমধ্যে আমি স্নান খাওয়া সেরে নিই। তারপর পাকাপাকি একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।

বিল্টু উঠে দাঁড়াল। আমি ওকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম।

আমি যখন ওর বাড়িতে পৌঁছলাম ও জামাকাপড় পরে তৈরী। সঙ্গে সঙ্গেই সে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে পড়ল।

উদ্দেশ্যটা তখনও খোলাখুলি না বলাতে আমি একটু অন্ধকারেই রইলাম। শেষ পর্যন্ত ওর নির্দেশেই বাসের পথে পা বাড়ালাম। আউটরামঘাটে পৌঁছতে, আমরা দুজনেই নেমে পড়লাম বাস থেকে। একটু ঘোরাঘুরি করতেই বেশ কজন মাঝি এগিয়ে এল গঙ্গাবক্ষে প্রমোদ ভ্রমণের প্রস্তাব নিয়ে।

বিল্টু সেটাই চাইছিল। একজন মাঝিকে ডেকে সে প্রস্তাব করল আগ্রা ভ্রমণের জন্য।

এ ধরনের প্রস্তাব সচরাচর আসে না বলেই হয়তো মাঝিটা কি ভাবল কিছুক্ষণ। তারপর ঘাড় নেড়ে জানাল সে রাজী আছে। তবে এজন্য ভাড়া হিসাবে সাতশ' টাকা দিতে হবে।

বিল্টু বোধহয় এই রকমই একটা কিছু আঁচ করেছিল। তাই সে বিশেষ আশ্চর্য হল না। আমার দিকে চেয়ে বললে, কিরে সাতশ টাকা খরচ করতে রাজী তো ভেবে দেখ।

নৌকোয় গেলে আমাদের দুটো বাড়তি সুবিধে মিলবে। এক শত্রুপক্ষ ঘুণাক্ষরেও এ খবর টের পাবে না। দুই আমাদের লক্ষ্যস্থল যমুনারই আশপাশের অঞ্চল, তখন নৌকায় গেলেই আমার মনে হয় সন্ধানকার্য ভালোভাবে চালাতে পারব। বিল্টুর বক্তব্য শুনে আমি না বলার মতো কোনও যুক্তি খুঁজে পেলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মতামত জানিয়ে দিলাম।

একশ টাকা বায়না দেওয়া হল মাঝিকে। ঠিক হল পরের দিন সন্ধ্যা সাতটায় আমাদের যাত্রা শুরু হবে।

মাঝি ওরফে সিরাজ নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য এই ঘাটেতে। তবে সন্ধ্যের আগেই সেখানে উপস্থিত হবার জন্য সে আমাদের বাববাব অনুবোধ কবল।

বাতেব অন্ধকাবে আমবা সব গোছগাছ শুরু করে দিলাম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে সাথে খাবার-দাবারও বেশ কিছু নেওয়া হল। কাবণ কখন কোথায় কি পাব না পাব কিছুই জানা ছিল না।

তাছাড়া এ পথে আমরা একেবারেই নতুন। অভিযানের সফলতা সম্বন্ধেও আমাদেব যথেষ্ট দুরাশঙ্কা ছিল। এমতাবস্থায় অন্য কোন ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল।

পরেব দিন বাতভোরেই আমরা দুজন বব্‌কে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলাম, এবং একটা আবাসিক হোটেলে ঘর ভাড়া করলাম।

হোটেলে ওঠার কাবণটা আমাব ঠিক বোধগম্য হচ্ছিল না। বিল্টুকে সেটা প্রশ্ন করতেই সে হেসে বলল, তোর দ্বারা কোনদিনই গোয়েন্দাগিরি হবে না দেখছি।

আমি বললাম, কেন? কি দেখে তা বুঝলি?

বিল্টু গম্ভীর হয়ে বলল, এটা পুরোই কমনসেন্সের ব্যাপার। ওরা নিশ্চয়ই গুপ্তধনের লোভে সারারাত জেগে বসে থাকবে না। যা কিছু ওদের করবার দিনেই শুরু করবে। ইতিমধ্যে যদি আমরা গা ঢাকা দিতে পারি ওদের পক্ষে যথেষ্টই উদ্বেগের কারণ হবে। ইতিমধ্যে ওরা আমাদের সম্পর্কে নানারকম বিরূপ ধারণা করবে এবং পেছু নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাবে।

এই সুযোগে আমরা তাদের চোখে ধুলো দিয়ে নাগালের বাইরে চলে যাব। ওরা যদি নেহাতই দিগভ্রান্ত হয়ে পড়ে সেটা আমাদের অভিযানের পক্ষেই মঙ্গলকর হবে।

বিল্টুর উপস্থিত বুদ্ধির তারিফ করে আমি ওর সঙ্গে করমর্দন করলাম।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লাগল। দুপুরের কড়া রোদ ক্রমশঃ নরম হতে, বিল্টু আর আমি ছদ্মবেশ নিতে বসলাম।

এ প্রস্তাবটা অবশ্য আমারই ছিল। হোটেল থেকে গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত যাওয়াও একটা ঝুঁকির ব্যাপার ছিল। যত্রতত্রই ওরা আমাদের দেখে ফেলতে পারে। ছদ্মবেশ নেওয়া শেষ হতে আমরাই পরস্পরকে চিনতে পাচ্ছিলাম না। মজা হল সবচেয়ে ববকে নিয়ে। সে গলার স্বর চিনলেও, আমাদের বেশভূষা দেখে বেশ বিস্মিতই হয়েছিল এবং বারবারই মনিবের গা শুঁকে শুঁকে ঘ্রাণ নিতে লাগল।

যথারীতি বিকেল হতে আমরা হোটেল ছেড়ে পথে নামলাম। অনায়াসেই বাসে যাওয়া যেত, কিন্তু সঙ্গে বব থাকাতে ট্যাক্সিই নিতে হল।

যেতে যেতে হঠাৎ একটা দোকানের সামনে বিল্টু দাঁড় করাল ট্যাক্সিটা। দোকান থেকে একটা বাইনাকুলার কিনে এনে আমার হাতে দিয়ে বললে, জানলা দিয়ে দেখ দেখি রেঞ্জটা ঠিক আছে কিনা। একথা আমার একবারেও মনে আসেনি। মনে মনে আবার বিল্টুর বুদ্ধির প্রশংসা করে, বাইনাকুলারে চোখ রাখলাম।

ঠিকই আছে। শিয়ালদা রেলস্টেশনের ঘড়িটা একেবারে হাতের মুঠোয় মনে হচ্ছে।

বিল্টুকে সেটা ফেরত দিয়ে বললাম, হ্যাঁ কাজ চলে যাবে।

বিল্টু হেসে বলল, তাহলেই যথেষ্ট।

সিরাজ আমাদের জন্য নৌকা নিয়েই অপেক্ষা করছিল। প্রথমটা সে আমাদের চিনতে পারেনি। পরে পরিচয় দিতে সে একটু লজ্জিতই হল।

দীর্ঘপথ বলেই হয়তো সিরাজ তার ভাগ্নে কামালকেও নিয়েছিল সাথে। আমাদের অবশ্য সেজন্য কোন আপত্তি ছিল না।

বরং দল ভারী হওয়ার জন্য আমরা মনে মনে খুশীই হয়েছিলাম।

আমাদের জিনিসপত্তর ওরাই তুলল নৌকাতে এবং ছইয়ের নীচে সাজিয়ে রেখে দিল।

মুস্কিল হল বব্‌কে নিয়ে। সে নৌকোতে উঠতে রাজী নয়। তাছাড়া সিরাজকেও মেনে নিতে পারল না। আমি তো রীতিমত ভেবে পড়লাম। ববের জন্যেই কি শেষ পর্যন্ত আমাদের অভিযান পণ্ড হবে নাকি?

বিল্টু কিন্তু ঘাবড়াবার পাত্র নয়। আমাকে টেনে তুলল নৌকাতে। তারপর সিরাজকে বলল, নৌকা ছেড়ে দিতে।

বব্‌ এতক্ষণ গোঁ ভরেই দাঁড়িয়েছিল পাড়েতে। কিন্তু নৌকা কয়েক হাত এগুতে, সে 'ঘেউ' 'ঘেউ' করে বার কয়েক ডেকে উঠল। তারপর দীর্ঘ একলাফে উঠে এল নৌকাতে।

এবার বিল্টু তাকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে সে খুশীতে লেজ নাড়তে লাগল।

ওদিকে শত্রু শিবিরে সকালবেলাই পৌঁছে গেল আমাদের

পলায়নের খবরটা। ললিতমোহন বাবুর ঘরে জরুরী মিটিং বসল।

তিনি বেশ উত্তেজিত হয়েই ছেলেদের বললেন, কি স্পাইং করলি তোরা। তোদের চোখে ধূলো দিয়ে ওরা চলে গেল। কিন্তু কোন ট্রেনে গেল তা তো জানা গেল না।

যা হোক আর এক মুহূর্ত তোদের এখানে থাকা উচিত নয়। তোরা তো তালা নিয়ে বসে আছিস কিন্তু চাবিটাই যে ওদের পকেটে।

এই ফুলদানির গায়ে আঁকা নক্সাগুলো আর একবার বুঝে নেওয়া যাক। যতদূর মনে হচ্ছে নীচে নদী আর ওপরে ফোর্ট।

মাঝখানে ফুটকিগুলো কি ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না। তবে ওরই মধ্যে এক জায়গায় মড়ার মাথাটা দেখা যাচ্ছে। সম্ভবতঃ ওটাই একটা কিছুর ইঙ্গিত বহন করছে। তা না হলে ওটা ওখানে দেখানোর কিই বা সার্থকতা থাকতে পারে। রিজার্ভেশানের জন্য আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই। যে ট্রেনে জায়গা পাস তাতেই রওনা হয়ে যা।

মনে রাখিস এই ভাগ্য-পরীক্ষায় তোদের জিততেই হবে। আর এই জিত্ মানে তোরা হবি লক্ষপতি।—এবার তিনি নীরব হতে তারা সঙ্গে সঙ্গেই মাথা নীচু করে সে নির্দেশ মেনে নিল।

স্থল পথে ছুটে চলেছে তুফান মেল জল পথে চলেছে ময়ুরপঙ্খী।

লাট্টু, জগা ও ভেটু তিনজনে একটা বাক্সের ওপর বসে, ফুলদানিটা নিয়ে নক্সাগুলি ভালো করে পরীক্ষা করছিল। জায়গাটা

তো কম বড় নয়। এর মধ্যে আসল জায়গাটা খুঁজে বার করা রীতিমত অগ্নি-পরীক্ষারই সামিল।

ওদিকে গঙ্গার ফুরফুরে হাওয়া খেতে খেতে, বিল্টু একটা গান ধরেছিল। মাঝে মাঝে আমিও গলা মেলাচ্ছিলাম তার সাথে।

স্রোতের অনুকূলে চলার জন্য নৌকা খুব দ্রুত গতিতেই এগুচ্ছিল।

সিরাজ খুবই মিশুকে প্রকৃতির। আমাদের খুঁটিনাটি আলোচনায় মাঝে মাঝে যোগ দিচ্ছিল সে। প্রায়ই সে জানতে চাইছিল আমাদের এই দুঃসাহসিক অভিযানের আসল উদ্দেশ্যটা কি।

কিন্তু বিল্টুর নির্দেশ থাকার জন্য এটা ওটা বলে চাপা দিচ্ছিলাম প্রসঙ্গটা। উত্তর না পেয়ে সে অবশ্য খুশী হচ্ছিল না। যে কারণে সুযোগ এলেই সে ওই একই প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করছিল।

ওর জিদের কাছে আমরা যখন প্রায় মাথা নীচু করতে চলেছি সেই মুহূর্তে হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। বব্ হঠাৎ জলের দিকে তাকিয়ে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে শুরু করল।

অচেনা কিছু দেখলেই বব্ সাধারণতঃ এইরকম চীৎকার করে থাকে।

আমরা দুজনেই ঝুঁকে পড়লাম নৌকা থেকে। চাঁদের জোছ্না পড়ে গঙ্গার জল চিকমিক করছিল। কিন্তু সে রকম কিছু চোখে পড়ল না।

ববের পাগলামি ভেবে আমি ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চাইলেও, বিল্টু কিন্তু দোমনা হয়েই রইল এবং অনবরতই জলের দিকে তাকাতে লাগল।

নৌকা যথারীতি দ্রুত বেগেই এগুচ্ছিল। বিল্টু আমাকে বললে,

দুজনে একই সঙ্গে রাত্রি জেগে কোন লাভ নেই। আয় পালা করেই ঘুমানো যাক্। প্রথম প্রহরটা আমি জাগি। তুই বরং একটু ঘুমিয়ে নে।

ঘুমানোর ব্যাপারে কোনদিনই আমি কখনও আপত্তি করিনি। কারণ এ ব্যাপারে আমার কোন রকম অসুবিধা নেই।

হাতের ওপর মাথা রেখে কাঠের পাটাতনে গা এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই দু'চোখ জুড়ে আমার ঘুম নেমে এল।

হঠাৎ বিল্টুর হাঁকাহাঁকিতে ঘুম ভেঙে গেল।

ধড়মড়িয়ে উঠে দেখলাম সে নৌকা থেকে মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখছে আর কামাল কি যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে।

আমি চোখ রগড়াতে রগড়াতে এগিয়ে গিয়ে সেখানে দাঁড়াতে, বিল্টু বলল, উই আর ইন ডেনজার। একটা হাঙ্গর আমাদের অনুসরণ করেছে। যে কোনও মুহূর্তেই বিপদ ঘটতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গেই ববের চীৎকারের কারণটা বুঝতে পারলাম। শিকারী কুকুরের চোখ সে এড়াতে পারেনি।

আমরা দুজনেই এ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। কি করণীয় জিজ্ঞাসা করলাম সিরাজকে।

সে একটু গম্ভীর হয়েই নৌকা চালাচ্ছিল। প্রশ্ন করতে সে এক মুহূর্ত ভেবে বলল, আমরা সবাই নৌকার ওপর। সে আর আমাদের কি ক্ষতিই বা করবে। তবে হ্যাঁ, ওর যদি নৌকা উলটে দেবার মতলব থাকে, তাহলে তো বিপদ ঘটাতেই পারে। আমিও লক্ষ্য করেছি তবে এখনও বুঝে উঠতে পারিনি ওর মতলবটা।

বিল্টু এতক্ষণ ঝুঁকে পড়েই তার মতিগতি লক্ষ্য করছিল।

সিরাজের কথা শুনে সে খুশী হল না। বললে, এখনও রাত ভোর হতে অনেক দেরি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অপেক্ষায় না থেকে, ওকে তাড়ানোর কোন উপায় নেই ?

ওরা সে ব্যাপারে তেমন কোন উৎসাহ না দেখালেও, আপত্তি করল না। নীরবেই নিজেদের কাজ চালিয়ে যেতে লাগল।

আমি বিল্টুর কাঁধে হাত রেখে বললাম, ওকে আঘাত করার মত আমাদের কিই বা আছে।

রিভলবার দুটো আসল হলেও নয় কথা ছিল, কিন্তু টয় দিয়ে তো আর কাজ হবে না।

এ ছাড়া—

বিল্টু বললে, তোর গুলতিটা বার কর। দেখি না ওটাতে কাজ হয় কিনা।

গুলতি দিয়ে কি হাঙর জব্দ করা যাবে ? মনে সায় না পেলেও সেটা তুলে দিলাম বিল্টুর হাতে।

টিপ তার অব্যর্থ। বেছে বেছে আমার হাত থেকে একটা বড় দেখে পোড়া মাটির গুলি নিয়ে গুলতিতে রাখল।

ইতিমধ্যে হাঙরটা আমাদের নৌকার সঙ্গে পাল্লায় না পেরে উঠে, আমাদের পেছন পেছনই আসছিল।

তার সুবিধাই হল। এক মিনিটেই লক্ষ্য স্থির করে সে গুলতিটা ছুঁড়ল তার উদ্দেশ্যে।

তীরের বেগে গুলিটা ছুটে গিয়ে লাগল তার মাথায়। হাঙরটা সঙ্গে সঙ্গে একবার হাঁ করল।

গুলিটা যে লেগেছে তার এটাই প্রমাণিত হল তার মধ্যে দিয়ে।

বিল্টুও একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল এবং উপর্যুপরি গুলতি ছুঁড়তে লাগল তাকে লক্ষ্য করে।

একটা চোখে লাগতেই হঠাৎ তার গতি শ্লথ হল। সে ভাসতে লাগল জলের ওপর।

আমাদের নৌকা অবশ্য যথারীতিই এগুচ্ছিল। হঠাৎ দেখলাম সে নেই। গেল কোথায়।

সিরাজকে প্রশ্ন করলাম। সে বলল, ডুব মেরেছে যখন আর আসতে নাও পারে।

আমাদের অবশ্য তখন আর কিছু করার ছিল না। অগত্যা আমি আবার শোবার তোড়জোড় করতে লাগলাম।

কিন্তু বিল্টু বাধা দিল। বললে, তোর আর শুয়ে কাজ নেই।

আমি শুই, তুই বরং এবার জেগে থাক।

ওদিকে তুফান মেল ছুটেছে দুর্বার গতিতে। ওরা তিনজনেই ঝিমুচ্ছিল বাঙ্কের ওপর। কারুর মুখে কোনও কথা নেই।

দেখতে দেখতে সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল।

লাট্টু আড়মোড়া ভেঙে বসল। কামরার ভেতরে একটা চা-ওলা ঢুকে চা বিক্রি করছিল।

বাঙ্কের ওপর বসেই সে কাঁচের গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল তার দিকে। মুচকি হেসে বললে, কিরে চা গরম তো?

চাওলা এমনভাবে ঘাড় নাড়ল হ্যাঁ বা না দুইই হতে পারে।

লাট্টু সেটা ভাগ করল তিন ভাগে এবং বাড়িয়ে দিল তার সঙ্গীদের দিকে।

চা-টা ঠাণ্ডা হলেও টেস্ট খারাপ নয়। খুশী মনেই সকলে চায়ের কাপে চুমুক দিল।

ওদিকে বিকেল যেতে ক্রমশঃ সন্ধ্যা নেমে এল। জানলা দিয়ে দু'ধারে প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো আর স্পষ্টাস্পষ্টি দেখা যাচ্ছে না। ছায়ার মতোই ক্রমে ক্রমে তা অস্পষ্ট হয়ে আসছে।

চা খেয়ে ঝিমুনি কেটে গেল সকলের। জগা বাঙ্ক থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল টয়লেটে যাবার জন্য।

হঠাৎ একটা আর্তনাদ ভেসে এলো বাইরে থেকে। লাট্টু লাফিয়ে নেমে পড়ে মুখটা বাড়িয়ে দিল জানলা দিয়ে।

পাশের সব কামরা থেকেই শত শত যাত্রী মুখ বাড়িয়ে কি যেন দেখছে।

ট্রেন চলন্ত বলেই প্রকৃত ঘটনাটা জানতে অসুবিধা হচ্ছিল সকলের। ক্রমশঃ ঘটনাটা প্রকাশ হতে আঁতকে উঠল লাট্টু। কন্ট্রোল রুমের গাফিলতিতে লাইন পালটিয়ে ট্রেনটা অন্য আর এক লাইনে ঢুকে পড়েছে। আর ড্রাইভার মুহুর্মুহুঃ হুইসিল দিয়ে তাদের বিপদের কথা জানিয়ে দিচ্ছে।

ইতিমধ্যে বিপদ আরও ঘনীভূত হয়ে উঠল। যে লাইনে তুফান ঢুকেছিল, বিপরীত দিক থেকে আর একটি মালগাড়ি এগিয়ে আসছিল সেদিকে।

সাময়িক উত্তেজনায় যখন সবাই থরথর, জেঠু বললে ট্রেনের গতি মন্থর হলেও থামতে সময় লাগবে। আমাদের কি কোনরকম ঝুঁকি নেওয়া উচিত? কিছু হলে কিন্তু দেখাই সুবিধে হবে। অর্থাৎ বিনা বাধায় গুপ্তধনটা আমরা হাতিয়ে নেবে।

গো—৬

জগা বলল তাহলে কি করবি ?

—আয় আমরা বরং লাফিয়ে পড়ি ট্রেন থেকে। এতে হয়তো বা কাটতে ছড়তে পারে কিন্তু প্রাণে মরব না এতো সহজে।

লাট্টু নীরবেই শুনছিল ওদের কথাবার্তা। ভেটুর প্রস্তাবটা তার কাছে খুবই সময়োপযোগী মনে হল। সে বললে, তাহলে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয়।

দরজার ধারেই তারা তিনজনে দাঁড়িয়ে ছিল। একে একে তারা ঝাঁপ খেল কামরা থেকে।

তাদের এই কাণ্ড দেখে কামরার অন্যান্য যাত্রীরাও একে একে সেই পথে এগুতে লাগল।

ফলে চীৎকার চেঁচামেচি আর হৈ হট্টগোলে মুখরিত হয়ে উঠল চারদিক। অনেকেই 'বাঁচাও' 'বাঁচাও' বলে চীৎকার করতে লাগল।

কিন্তু ড্রাইভারের উপস্থিত বুদ্ধিতে তারা বেঁচে গেল। তুফান নিজে দাঁড়াল এবং মালগাড়িটিকেও বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে দাঁড় করাল।

যাত্রীরা যারা ট্রেন থেকে নামেনি তারা মোটামুটি বেঁচে গেল। কিন্তু যারা ঝাঁপ খেয়েছিল তারাই পড়ল বিপদে।

ভেটুর কিছু না হলেও, লাট্টু ও জগার চোট বেশ গুরুতরই হল। লাট্টুর মচকে গেল পা, আর জগার ফাটল কপাল।

দুজনকেই স্থানীয় হাসপাতালে যেতে হল চিকিৎসার জন্য। ভেটু পড়ল মুস্কিলে। আহত অবস্থায় ওদের টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি ?

অপেক্ষা করতেই হল তাদের। বিশেষ করে লাট্টুর পা স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নড়ার কোনও উপায় রইল না।

দেখতে দেখতে তিনদিন কেটে গেল। লাট্টুর আপাততঃ অন্য কোনও অসুবিধা না থাকলেও, একনাগাড়ে বেশীক্ষণ হাঁটা তার পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কেমন যেন কমজোরী মনে হচ্ছিল নিজেকে।

অগত্যা লাঠির সাহায্য নিতে হল তাকে। ঈষৎ খোঁড়াতে খোঁড়াতেই সে আবার উঠল ট্রেনে।

এদিকে হাঙ্গরের হাত থেকে রেহাই পাবার পর আর তেমন কোনও অসুবিধায় পড়তে হয়নি। এই কদিনে আমরা এলাহাবাদ অতিক্রম করে যমুনা পথে আগ্রার দিকে রওনা হয়েছি। পথের দুধারে নবাব বাদশাদের ঐতিহাসিক কীর্তিগুলি একে একে চোখে পড়তে শুরু করেছে।

বিল্টু এবং আমি দুজনেই বাইনাকুলারের সাহায্যে ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপগুলো তন্ময় হয়ে দেখছিলাম।

বিল্টু হঠাৎ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বললে, যদিও আমাদের শত্রুদের সঙ্গে আমরা যথেষ্ট ব্যবধান রেখে চলেছি, তাহলেও এখানে আমাদের চিরাচরিত পোশাকে নামা উচিত নয়। আমরা বরং মুসলমান পীরের বেশই ধারণ করি। এতে একদিকে যেমন আমাদের চেনায় অসুবিধা হবে, তেমনি ওই গুপ্তধন লুকানো কবরটি খুঁজে বার করতেও বাড়তি সুবিধা হবে।

কারণ স্থানীয় মুসলমানেরা মুসলমান দেখলে যতখানি সহযোগিতা করবে হিন্দুদের বেলায় ততোটা না দেখাতে পারে। তার বক্তব্যটা যথেষ্টই যুক্তিগ্রাহ্য মনে হল আমার কাছে।

নৌকায় বসেই আমরা পোশাক পরিবর্তন করতে শুরু করলাম।

আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে সিরাজ এবং কামাল দুজনেই হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

তবে সেটা সাময়িক। পরে তারাই আমাদের সাহায্য করতে লাগল নিখুঁত পীর সাজার ব্যাপারে।

কিছু দূরেই আগ্রা ফোর্ট দেখা যাচ্ছিল।

বিল্টু বললে, আর নৌকায় বসে থেকে লাভ নেই। চল্ এবার নেমে পড়া যাক্। এবারই তো আসল অভিযান শুরু।

আমি বললাম প্রস্তুত।

এই কদিনে সিরাজ ও কামালের সঙ্গে আমাদের একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমরা নামবার প্রস্তাব করার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম ওরা একটু নিরানন্দই হয়ে পড়ল।

কামাল বললে, কাজ সেরে আপনারা ফিরবেন কবে নাগাদ?

তার প্রশ্ন শুনে স্বভাবতঃই আমরা একটু বিব্রত হলাম। কারণ এর সঠিক কোনও উত্তর আমাদের কারুর পক্ষেই এখুনি দেওয়া সম্ভব ছিল না।

বিল্টু বললে, হঠাৎ এই প্রশ্ন করছ কেন?

সিরাজ বললে, আমরা তো খালি নৌকা নিয়েই ফিরে যাব। আপনারা ইচ্ছে করলে এতেই ফিরতে পারতেন।

বিল্টু হা-হা করে হেসে উঠে বলল, আমাদের খুব শাঁসালো পার্টি ঠাউরেছ মনে হচ্ছে। অত টাকা আমাদের নেই।

নেহাত লটারীতে কিছু প্রাপ্তিযোগ ঘটেছে তাই এই এ্যাডভেঞ্চার। তা নাহলে হয়তো পায়ে হেঁটেই এখানে আসতে হতো। যা হোক

ফিরব আমরা ট্রেনেই। তবে যদি তোমরা কম ভাড়ায় নিয়ে যেতে রাজী হও তাহলে অবশ্য আপত্তি নেই।

বিল্টুর কথা শুনে তারা পরস্পরের দিকে তাকাল। সিরাজ আমাদের মুখের তাকিয়ে এক মিনিট কী যেন ভাবল। তারপর মৃদু হেসে বললেন, বেশ তাই যাবেন। তবে ভাড়ার কথা এখন কিছু বলব না। ওটা আপনাদের বিবেচনার ওপরেই ছেড়ে দিলাম।

তাদের সঙ্গে মোটামুটি কথা হল, আপাততঃ সাতদিন তারা এই ঘাটেই নৌকা বেঁধে রাখবে। এই সাতদিনে আমাদের কাজ না মিটলে তারা স্বদেশে ফিরে যাবে।

ঝোলাঝুলি নিয়ে এবার দুজনে বেরিয়ে পড়লাম পেছন পেছন চলল বব্। বিল্টু তার হাতের নক্সাটা মেলে ধরল চোখের সামনে।

বিস্তীর্ণ বালুকাময় নদীর তীরভূমিতে, দূরে ছবির মতোই আগ্রা দুর্গকে দেখা যাচ্ছিল বটে কিন্তু কবরখানার কোন অস্তিত্ব চোখে পড়ছিল না।

আমি বললাম, বিল্টু, কী বুঝছিস? ঘরে বসে নক্সা দেখা আর বাস্তবের মধ্যে ফারাক কতখানি এবার বুঝতে পারছিস?

সে কলের পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে বলল, খুবই। এখন তো নানারকম আশঙ্কা জাগছে। নদীর জল সেগুলো গ্রাস করেছে কিনা কেইবা বলতে পারে!

আমি বললাম, চল না কাউকে জিজ্ঞাসা করা যাক্।

সে বললে, জিজ্ঞাসা করব কাকে। চারদিকই তো খাঁখাঁ করছে।

সত্যিই জিজ্ঞাসা করার মতো কোন লোক তখন চোখে পড়ছিল

না। নদীর জলে দু চারজন স্নান করছিল বটে কিন্তু তারা সবাই মহিলা ও শিশু।

নদীবক্ষে অবশ্য দু'চারটি নৌকা ভাসছিল। কিন্তু অতদূরে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করা খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না।

দুজনে নদীর তীর ধরে হাঁটছি। আমাদের ছদ্মবেশ থাকার ফলে স্নানরতা মহিলা বা শিশু কারুরই আমাদের প্রতি তেমন লক্ষ্য নেই।

রোদ্দুরের তেজ বেশ প্রখরই। খানিকটা হাঁটার পর বিল্টুর প্রস্তাব মতোই আমরা স্থানীয় ভাড়ার ঘর সন্ধান করতে লাগলাম।

এলোমেলো ঘুরে ঘুরেই আমাদের সারাদিনটা কেটে গেল। সন্ধ্যে হতেই এবার আশ্রয়ের সন্ধানে আরও বেশী তৎপর হয়ে উঠলাম।

কাছাকাছি এক মুসলমান পাড়ায় শেষপর্যন্ত থাকার একটা ঘর মিলল। টুরিস্টদের জন্যই তৈরী এই ঘরগুলোর ভাড়াও খুব বেশী নয়।

আমরা কলকাতা থেকে গিয়েছি শুনে ঘরের মালিক খুবই খুশী হল। কিন্তু মুস্কিলে ফেলল রাজনীতি সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে।

বিল্টু অবশ্য হারবার ছেলে নয়। বাজারে যাবার ছুতো করে আমাকে নিয়ে সে সরে পড়ল সেখান থেকে।

রাত্রিটা ভালোই কাটল। কদিন নৌকায় ঘুমালেও ঘুম কারুরই মনোমত হয়নি।

ভোরবেলা যখন ঘুম ভাঙল, দেহে আর বিন্দুমাত্র জড়তা নেই।

যথারীতি প্রাতরাশ সেরে আবার আমরা যাত্রা করলাম ফোর্টের দিকে। নেহাত দরকারী জিনিসগুলোই সঙ্গে নিলাম। বাকী পড়ে রইল সেই ঘরে তালা বন্ধ অবস্থায়।

আমরা পায়ে হেঁটেই চলছিলাম। কখন কার কাছ থেকে কি হদিস পাওয়া যায়! তবে বাঙালীর মুখ একেবারেই বিরল। কিংবা চোখে পড়লেও বাঙালী বলে চেনবার উপায় নেই।

বেশ কিছু পথ এগুনোর পব যমুনার জল আমাদের চোখে পড়ল। রঙীন সূর্য কিরণে সে জলে রঙের স্রোত বইছে।

হঠাৎ আমি চীৎকার করে উঠলাম, ম্যান্ ম্যান্!

বিল্টু অন্যমনস্ক হয়েই বলল, কীরে তুই কি কলম্বাস হয়ে গেলি নাকি?

'একজ্যাক্টলি' বলে আমি অঙ্গুলি নির্দেশ করলাম। নদীর একপ্রান্তে সাধুবেশী তিনটি লোক মুখোমুখি বসে গুলতানি করছে।

বিল্টু ওদের দেখে খুশীই হল। বললে, চল ওদের একটু বাজিয়ে আসি।

ওরা তিনজনে এমনভাবে বসেছিল, আমরা পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে টেরই পেল না। আমরা ওদের হাবভাব যাচাই করতে লাগলাম।

সম্ভবতঃ ওরা কোনও বিষয়ে শলাপরামর্শ করছিল। কারণ তাদের সবকথা শোনা যাচ্ছিল না। মাঝে মাঝে ভেসে আসছিল।

হঠাৎ একজন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠল, বাবলুর জন্যে তো চিন্তা

নেই। চিন্তা ওই বিল্টেটাকে নিয়ে। যেভাবে ও উঠে পড়ে লেগেছে গুপ্তধন না হাতিয়ে ছাড়বে না দেখছি।

তাদের আলোচনায় আমাদের নাম উঠতে রীতিমত বিস্মিত হলাম দুজনে। আমি বিল্টুর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সে বললে, কেস্ খারাপ। চল আমরা সরে পড়ি এখান থেকে।

যে ভয় করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল।

লাট্টু তার চেলাচামুণ্ডেদের নিয়েই হাজির হয়েছে সেখানে।

ওদের দেখা মাত্রই আমরা দ্বিগুণ তৎপর হয়ে উঠলাম। কারণ ওরা এসে পোঁছেচে যখন সহজে আমাদের কাছে নতিস্বীকার করবে না।

নদীর দু'ধারে চোখ রেখে আমরা চলেছি।

ইতিমধ্যে তিনটে গোরস্থানের সন্ধান আমরা পেয়েছি। ফোর্টের পূর্বপ্রান্তে দুটি ও পশ্চিমপ্রান্তে একটির। শুধু তাই নয়, এই তিনটি বহু পুরাতন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ অনেকেই এখানে স্থান পেয়েছে।

যে কারণে এর ভেতরে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। আন্তর্জাতিক চোরেরা এইসব বিখ্যাত লোকদের পোশাকাদি এবং জিনিসপত্তর চুরি করার লোভে প্রায়ই এই গোরস্থানে হানা দেওয়ার ফলেই এই কড়াকড়ি।

তাছাড়া কঙ্কাল চুরিরও হিড়িক আছে।

সারাদিনটাই কেটে গেল আমাদের ঘুরে ঘুরে। অবশ্য মোটামুটি খবর সংগ্রহ করায় তেমন ক্লান্তি বোধ করলাম না।

আমরা যে ঘরটা ভাড়া নিয়েছিলাম পাশের ঘরটা খালিই ছিল। কিন্তু ফিরে আসতে দেখলাম ভেতর থেকে বন্ধ।

নতুন অতিথি সমাগম হয়েছে সেটা বুঝতে কোনই অসুবিধা হল না। মনে মনে বরং একটা অকারণ কৌতূহল উঁকি মারল।

ইতিমধ্যে বাড়ির মালিক আমাদের খোঁজ-খবর নিতে এসে একটা সুখবর দিলেন। বললেন, তিনজন কলিকাতাবাসী এসে উঠেছেন পাশের ঘরে। ইচ্ছে করলে আপনারা আলাপ করতে পারেন তাদের সঙ্গে।

শুনে মুখে আমরা কিছু প্রকাশ করলাম না বটে কিন্তু মনে মনে প্রমাদ গুনলাম। সেই রাতেই সেখান থেকে সবে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম।

দু'দিন অবিরাম ঘোরাঘুরির ফলে আর কিছু না পাই পথ-ঘাট মোটামুটি আমাদের রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে পথ চলতে তাই আমাদের বিশেষ কোনও অসুবিধা হচ্ছিল না। তাছাড়া বব্‌ও এ ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করছিল। চাঁদের জোছ্‌নাও আমাদের দিক নির্ণয়ে সাহায্য করছিল বিচ্ছুরিত আলো দিয়ে। ভোররাত্রি নাগাদ আমরা প্রথম পূর্ব প্রান্তের গোরস্থানটার সামনে এসে দাঁড়ালাম। পথের দুটো কুকুর আমাদের দেখে ডাকতে লাগল। কিন্তু বব্ তেড়ে যেতে তারা গা ঢাকা দিল। গোরস্থানটার সামনে পৌঁছে কি কারণে জানি না হঠাৎ গায়ের ভেতর ছমছম করে উঠল।

সুমুখে ফটক বন্ধ। ফটকের ভেতর দিয়ে সারিবদ্ধ স্মৃতি-সৌধগুলো দেখা যাচ্ছে।
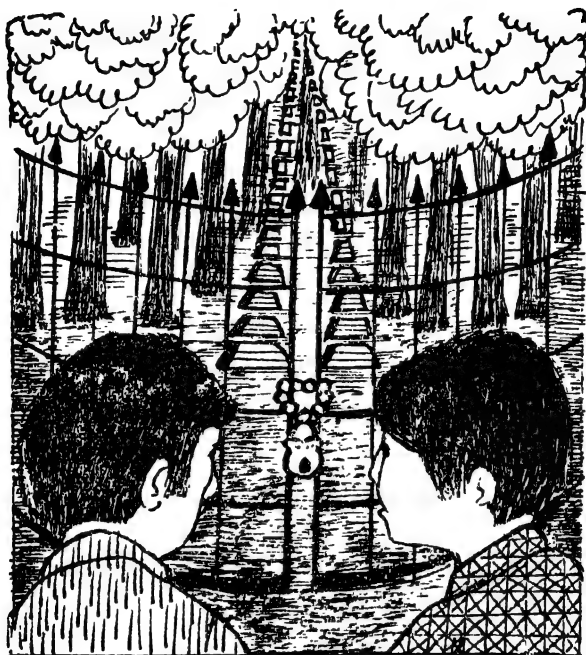
বিল্টু এক মিনিট দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবল। সামনে একটা গাছ থেকে কটা ফুলের ডাঁটি ভেঙে নিয়ে ঝোলায় ভরতে ভরতে বললে, নে রেডী হ, পাঁচিল টপকাতে হবে। কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না।

সত্যিই ভাববার অবকাশ ছিল না। বব্‌কে ইশারা করামাত্রই সে ফটক টপকে চলে গেল ওপারে। এবার ঠাকুরের নাম জপ করে

বিল্টুর সাথে সাথে আমিও চোখ বুজে লাফ মারলাম এবং ভেতরে ছিটকে পড়লাম।

ভেতরে ঢুকে বিল্টু বললে, স্টেডি। একসাথে ঘুরে লাভ নেই। দুজনে দু'দিকে যাওয়াই ভাল। গুনে বিশ নম্বর কবরে লক্ষ্য করাব মড়ার মাথা আঁকা আছে কিনা।

সন্ধান মিললে এইখানেই ফিরে আসবি। আমরা দুজনে একই সাথে হানা দেব।

কথামতই আমরা দুজনে দুদিকে এগুলাম। মাঝে বব্ পাহারা দিতে লাগল।

চাঁদের জোছ্নায় প্রতিটি কবরের ওপর চোখ বুলিয়ে এগুতে লাগলাম বটে, কিন্তু যথেষ্ট অসুবিধা হতে লাগল। কারণ শ্যাওলা ও গাছপালায় অধিকাংশ কবরই ঢাকা পড়ে গিয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টা ধরে তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজির পর হতাশ হয়ে ফিরে এলাম পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে। এবার সে-স্থান ত্যাগের পালা।

বিল্টু প্রথমে আমাকে আর বব্‌কে ঠেলেঠুলে তুলে দিল পাঁচিলের ওপর। এবার সে নিজে ওঠার চেষ্টা করার মাত্রই পেছন দিকে কে যেন তার আলখাল্লাটা ধরে গর্জে উঠল।

বব্ নেমে পড়েছে। আমি তখন ঘুরে দাঁড়িয়ে লাফ মারার জন্য তৈরী হচ্ছিলাম। গর্জন শুনে ঘুরে তাকাতেই আমার হাত পা হিম হয়ে গেল।

আগন্তুক আমাকেও ধমকে পাঁচিল থেকে নামবার জন্য নির্দেশ দিল। বন্ধুর মুখ চেয়েই আমি পালাবার কোনও চেষ্টা করলাম না। অযথা হৈ চৈ না করে নেমে এলাম পাঁচিলের ওপর থেকে।

আগন্তুক আমাদের সাজপোশাকের ওপর চোখ বুলিয়ে বললে, আমি এখানকার তত্ত্বাবধায়ক। আমাকে না জানিয়ে এখানে ঢুকেছ যখন, তোমাদের চোর বলেই ধরব নিশ্চয়ই। ইদানীং এখানে থেকে মৃত কঙ্কাল প্রায় চুরি হয়ে যাচ্ছে।

অভিযোগ শুনে আমার তো ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ। আমি যে কথা কইতে পারি মনেই হচ্ছিল না।

বিল্টু বোধহয় মনে মনে তৈরী ছিল। ঝোলার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে সেই ফুল কটা বার করে বললে, আমরা পর্যটক। আসছি বাংলাদেশ থেকে।

কিছুক্ষণ আগে আমরা এসে পৌঁছেচি এখানে। চলে যাব কাল ভোরে। এখানে আমাদের কিছু প্রিয়জন আছে। আমরা তাঁদের সমাধিতে ফুল দেবার জন্যই এখানে ঢুকেছিলাম।

বিল্টুর কথা শুনে সে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মিনিট। 'পোশাকের গুণেই হয়তো সে আমাদের কথা অবিশ্বাস করল না। বললে, আপনারা এভাবে না ঢুকলেই বোধহয় ভালো করতেন।

আমাদের সতর্ক করে দিয়ে সে ফটকটা খুলে দিয়ে বললে, যান!

এদিকে মধ্যরাত্রি তখন অতিক্রান্ত।

আমরা ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলাম সেখান থেকে। বিল্টু হেসে বললে, খুব জোর বেঁচে গেলাম। যা হোক্, চল এবার পরের গোরস্থানটা দেখা যাক। নদীর তীর ধরে আমরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চলেছি। তখনও চাঁদের জোছনা থাকার জন্য বাড়ি বা উদ্যান চিনতে

তেমন কোনও অসুবিধা হচ্ছে না। তবে বড় বাগানবাড়িগুলো প্রায়ই গোরস্থান বলে ভুল হয়ে যাচ্ছে।

প্রায় মাইলখানেক আমরা হাঁটলাম। পথের বাঁদিকে কাঁটা তারের বেড়ায় ঘেরা একটা উদ্যান দেখেই বিল্টু বললে, দেখ দেখ ভেতরে কত সমাধি। এটা নিশ্চয়ই একটা গোরস্থান হবে।

আমি প্রায় ছুটেই গেলাম সেই দিকে। মুখ বাড়াতেই আনন্দে আমার বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গেই ইশারায় সে-খবর জানিয়ে দিলাম বিল্টুকে। সে চোখেতে বাইনাকুলারটা লাগিয়ে কি যেন দেখছিল। ইশারা পেয়েও সে এলো না। সেই ভাবেই সে বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলো সে আমার কাছে। খাটো গলায় বললে, সর্বনাশ হয়েছে। সম্ভবতঃ লাট্রুরাই সদলবলে এই দিকে আসছে।

আমি অপ্রত্যাশিত এই সংবাদে বেশ ঘাবড়িয়ে গেলাম। বললাম, সে কিরে?

বিল্টু বললে ঘাবড়াবার কোনও কারণ নেই। ওরা ফুলদানির ছবি থেকে জায়গা মোটামুটি বুঝেই ফেলেছে। কিন্তু সাঙ্কেতিকটা যখন হস্তগত করতে পারেনি, গুপ্তধন খুঁজে বার করা ওদের পক্ষে খুব সহজ হবে না।

এই সুযোগেই আমাদের কার্যোদ্ধার করতে হবে। চল আমরা বরং এই উদ্যানের ভেতর আত্মগোপন করি।

কাঁটা তারে ঘেরা হলেও ফটকটা খুবই সুন্দর। বাইরে থেকে তালা ঝুলছে।

আমরা দুজনে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। এবং চারদিকে তাকাতে লাগলাম।

লোকজন কাছাকাছি কোথায় আছে বলে মনে হল না।

আমি বললাম, তাহলে কাঁটা তার টপকাতে হবে নাকি?

বিল্টু একটু অন্যমনস্ক ভাবেই ঘাড় নাড়ল। এবং চোখে বাইনাকুলার লাগিয়ে কি যেন দেখতে লাগল।

এই তারের বেড়া যে বহু পুরানো তাতে কোনই সন্দেহ নেই। কিছু কিছু তারও কেটে গিয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু সেখান দিয়ে শরীর গলানো খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। তীক্ষ্ণ কাঁটার খোঁচায় যে কোনও বিপত্তিই ঘটতে পারে।

বিল্টু হঠাৎ আমার কাঁধ স্পর্শ করে বললে, দেখ দেখ কে একজন যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে।

আমি অবশ্য খালি চোখেই তাকালাম। দূরে গাছপালা থাকার জন্য স্পষ্টাস্পষ্টি কাউকে দেখতে না পেলেও অনুভব করলাম কে যেন একজন আসছে। বিল্টু বললে, অপেক্ষা করা যাক্। দেখিই না কে! ক্রমশঃ আমাদের দিকেই এগিয়ে এল সে। প্রায় সামনা সামনিই এসে দাঁড়াল। বয়সে প্রবীণ। বেশ সৌম্য চেহারা। চুলদাড়ি পেকে সব সাদা হয়ে গিয়েছে। গায়ে একটা বাদামি রঙের আলখাল্লা। এক হাতে সাপ লাঠি। এক হাতে লোটা।

আমাদের দুজনের মুখ দুটো ভালো করে নিরীক্ষণ করে বললে, নবাগত মনে হচ্ছে। এই ভোর রাতে কবরখানার আশেপাশে ঘোরা-ঘুরির কারণ জানতে পারি?

বিল্টু সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বললে, আমরা অতিথি। এই

গোরস্থানে আমাদের এক প্রিয়জনকে ফুল দিতে এসেছি। ঝোলা থেকে সে ফুলের গুচ্ছ বার করে তাকে দেখাল।

আগন্তুক মৃদু হাসল। অবশ্যই দেবে। আমার সঙ্গে এস। ফটক খুলে দিচ্ছি। আলখাল্লার পকেটে হাত ঢুকিয়ে সে চাবি বার করল। তালা খুলে আমাদের বললে, তোমরা কাজ সার। আমি যমুনায় প্রাতঃ-স্নানটা সেরে আসি।

যেমনই সে ধীরে ধীরে এসেছিল, তেমনই ধীরে ধীরে সে চলে গেল যমুনার দিকে। আমরা একমুহূর্ত সময় নষ্ট করলাম না। সঙ্গে সঙ্গেই কবরখানায় ঢুকে অনুসন্ধানেব কাজ শুরু করে দিলাম।

এদিকে লাট্টুরা নদীর ধার ধরেই এগুচ্ছিল। পথেই সেই আগন্তুকের সাথে দেখা হল তাদেরও।

লাট্টু খুব বিনীতভাবেই বলল, আমরা এখানে নবাগত। পথঘাট কিছুই চিনি না। আমাদের দুজন সঙ্গী বিচ্ছিন্ন হয়ে এই পথেই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আপনি কি তাদের কোনও হদিস দিতে পারেন?

আগন্তুক লাঠি ঠুকে ঠুকে বললে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। তারা ঢুকেছে সামনের ওই কবরখানায়। তাদের কে একজন প্রিয়জন আছে সেখানে। ফুল দিতে চায় সমাধিতে। ওখানে গেলেই দেখা মিলবে।

এই খবর শোনা মাত্রই লাট্টুর চোখ খুশীতে চক্‌চক্ করে উঠল। ভেটুর কানে কানে বললে, বুঝলি তো ফুলদানির গায়ে ওই ফুটকিগুলো আর কিছুই নয় কবর। ওরা গুপ্তধনের সন্ধানেই ওখানে ঢুকেছে।

জগা বললে, তাহলে আর এক মুহূর্ত বিলম্ব নয় তাড়াতাড়ি চল। বলা যায় না তো যদি হাতছাড়া হয়ে যায়!

এদিকে শত্রুকে রুখতে আমরা বব্‌কে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখলাম। পাহারাদানে সে একাই যথেষ্ট।

যথারীতিই আমরা সতর্ক দৃষ্টি মেলে ভেতরে এগুচ্ছি, গুনতিতে বিশ নম্বর কবরটি আসতেই চমকে উঠলাম। বিবর্ণ ও মলিন কবরটার ইটের বেদীতে সত্যিই একটা মড়ার মাথা আঁকা রয়েছে।

এটা যে খুবই পুরানো সেটা তার ইটের চেহারা থেকেই প্রমাণিত হল। ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেগুলো প্রায় বিস্কুটের মতোই পাতলা হয়ে গিয়েছে। তার ফাঁক থেকে বেরিয়েছে রকমারি বুনো ফুলের গাছ। কোনটিতে আবার ফুলও ফুটেছে ঝাঁকে ঝাঁকে।

আমার কাছ থেকে সাড়া পাওয়ার মাত্র, বিল্টু তিন লাফে এসে হাজির হল সেখানে।

পকেট থেকে নক্সাটা বার করে তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে লাগল। তারপর 'হু-র-র্‌-রে' বলে লাফিয়ে উঠল।

তার এতটা উচ্ছ্বাস আমার ভাল লাগল না। আমি তাকে সংযত হতে বললাম। সে আমার কথা রাখল।

আমি বললাম, যা করার খুবই তাড়াতাড়ি করতে হবে। কারণ শত্রু নিকটেই।

বিল্টু আমার কথা মেনে নিতে, এবার আমরা কবর খোঁড়ার কাজে লেগে গেলাম।

গাঁথুনিটা এতই আল্গা হয়ে গেছিল হাতুড়ি দিয়ে কয়েক ঘা দেবার মাত্রই ইটগুলো খুলে খুলে আসতে লাগল।

আর ইঁটের স্তূপ সরাতেই বেরিয়ে পড়ল একটা সুদৃশ্য কাঠের বাক্স। আর সেই বাক্স খুলতেই বেরুল দীর্ঘাকৃত একটা সুন্দর পেটমোটা মাটির পুতুল।

পর পর তুটোই মিলল। এবারই শেষ পর্ব। এবার হাতুড়ি দিয়ে তার পেটে আঘাত করতেই, পেট ফেটে চৌচিব।

শেষ পর্বও মিলল। রাশি রাশি হীরা জহরৎ, মণি মুক্তো আর সোনা-দানা বেরিয়ে পড়ল তার পেটের ভেতর থেকে।

তু'জনে প্রায় একসাথেই চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু হঠাৎ একটা বোমা ফাটার শব্দ হল। এবং বব্ ক্রমাগত চিৎকার করতে লাগল।

বব্ যে বিপদের সম্মুখীন সেটা বুঝতে আমাদের কোনই অসুবিধা হল না।

পাঁচ মিনিটও কাটল না, বব্ ইতিমধ্যেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে হাজিব হল সেখানে। পায়ে তার বোমার ঘা-ই লেগেছে তবে মুখ তার যেরকম রক্তাক্ত, সে যে প্রতিশোধ নিতে ভোলেনি সেটাই প্রমাণিত হল।

এদিকে বিপুল ঐ ঐশ্বর্য দেখে বার বারই আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছিল। আমি বললাম বিল্টু যা পারিস ঝোলায় পুরে নে। আমি তোকে পাহারা দিচ্ছি।

ঝোলা থেকে রিভলবার তুটো বার করে আমি ফটক তাক্ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। বিল্টু বেছে বেছে দামী মণিমুক্তো ঝোলায় ভর্তি করতে লাগল।

ইতিমধ্যেই আর একটা কাণ্ড ঘটল।

হঠাৎ সেই ত্রিমূর্তির আবির্ভাব ঘটল ফটকে। ভেটুর ট্রাউজারের নিম্নাংশ তখন রক্তে ভিজে লাল। সম্ভবতঃ এটা ববেরই কামড়ানোর ফল।

ওরা বিল্টুকে কবরের মধ্যে থেকে ধনরত্ন ঝোলাভর্তি করতে দেখে, খুশীতে ডগমগ করে উঠল এবং নিজেদের মধ্যে কি একটা শলা-পরামর্শ করতে শুরু করল।

আমি বিল্টুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, আর দরকার নেই। যা পেয়েছি যথেষ্ট। চল এবার পালাই। ওরা এখুনি আমাদের আক্রমণ করবে।

বলাব সঙ্গে সঙ্গেই ওরা হৈ চৈ করে উঠল এবং লোলুপ দৃষ্টিতে আমাদের দিকেই ধেয়ে আসতে লাগল।

আমি চটপট একটা রিভলবার ওর হাতে তুলে দিলাম। কবর ছেড়ে বিল্টু চলে আসতে, আমরা ফটকের দিকে এগুতে লাগলাম। আমাদের দুজনের হাতেই আগ্নেয়াস্ত্র দেখে, ওরা কয়েক মুহূর্তে থমকে দাঁড়াল তাবপর যথারীতি এগুতে শুরু করল।

ওদের এই দুঃসাহস দেখে, আমরা সরাসরি ওদের উদ্দেশ্যে রিভলবার তাক্ করলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কাজ হল। ওরা দুহাত তুলে আত্মসমর্পণ করল।

আমরা আর কোনওরকম সাড়াশব্দ না করেই বেরিয়ে পড়লাম গোরস্থান থেকে।

ওরা এক পলকে আমাদের দেখে নিল তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ওর মধ্যে।

এদিকে দ্রুত গতিতেই আমরা হাঁটতে লাগলাম। বেশ কিছু পথ চলার পর হঠাৎ একটা হৈ চৈ কানে এল।

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। পেছন ফিরতে লক্ষ্য করলাম এক বিরাট জনতা সেই কবরখানা ঘিরে ফেলেছে এবং 'ডাকাত' 'ডাকাত' বলে চীৎকার করছে। আর ওই ত্রিমূর্তি ওই মাটির পুতুলটা মাথায় নিয়ে কবরখানার মধ্যিখানে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ওদের এই দুবাবস্থা দেখে আমাদের পক্ষে মুচকি হাসা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। যতই হোক্ শত্রু তো বটেই!

সেখান থেকে সরাসবি আমরা নদীর ঘাটে পৌঁছলাম।

নৌকাটা সেখানেই বাঁধা ছিল। সিরাজ উনুনে আঁচ দেবার জন্য কাঠ চিরছিল।

আকস্মিক আমাদের আবির্ভাবে সে কিছুটা বিস্মিতই হল। আমরা তাকে কোনও রকম প্রশ্ন কবার অবকাশ দিলাম না। তাড়াতাড়ি নৌকায় উঠে পড়ে বললাম, এখুনি ছেড়ে দাও। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি আমাদের কলকাতায় পৌঁছতে হবে। জরুরী কাজ আছে।

সিরাজ আমাদের ব্যস্ততার কোনও কারণ অনুসন্ধান না করেই, কামালকে দড়ি খোলার নির্দেশ দিল।

নৌকা ভাসল যমুনাব জলে। সূর্যের উজ্জ্বল কিরণে উদ্ভাসিত চারদিক।

আমি একটু অন্যমনস্ক হয়ে বসেছিলাম। বিল্টু বললে, কী ব্যাপার এত ভাবছিস কি?

আমি বললাম, ঘরে কত জিনিস পড়ে রইল। খেয়াল আছে?

বিল্টু হোহো করে হেসে উঠে বললে, ওঃ এই কথা। যাক্‌গে। ওগুলো ধরে নে হারিয়ে গিয়েছে।

পরিবর্তে আমরা কি পেয়েছি দেখেছিস ? এই দেখ বলে সে ঝোলার মুখটা খুলে ধরল আমার চোখের সামনে।

আমি মুখ বাড়ালাম—আমার দু'চোখ ঝলসে উঠল সোনা-দানা মণি-মুক্তো আর হীরকের দ্যুতিতে !

—